ত্রয়োদশ অধ্যায়

সিদ্ধ পুরুষের আচরণ

এই ত্রয়োদশ অধ্যায়ে সন্ন্যাসীর ধর্ম এবং এক অবধূতের ইতিহাস বর্ণনা করা হয়েছে। চরমে সাধকের সিদ্ধ অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে।

শ্রীনারদ মুনি বিভিন্ন বর্ণ এবং আশ্রমের লক্ষণ বর্ণনা করেছেন। এখন, এই অধ্যায়ে তিনি বিশেষভাবে সন্ন্যাসীর ধর্ম বর্ণনা করেছেন। গৃহস্থ-আশ্রম থেকে অবসর গ্রহণ করার পর বানপ্রস্থ-আশ্রম অবলম্বন করা উচিত, যে আশ্রমে মানুষ প্রথমে দেহকে অস্তিত্বের উপায় স্বরূপ মনে করে, কিন্তু ধীরে ধীরে দেহের প্রয়োজনগুলি বিস্মৃত হয়। বানপ্রস্থ-আশ্রমের পর গৃহত্যাগ করে, সন্ন্যাসীরূপে বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করা উচিত। দেহের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ত্যাগ করে এবং দেহের প্রয়োজনের জন্য কারও উপর নির্ভর না করে, প্রায় নগ্ন হয়ে সর্বত্র ভ্রমণ করা উচিত। সাধারণ মানব-সমাজের সঙ্গ না করে ভিক্ষা গ্রহণপূর্বক সর্বদা আত্মতৃপ্ত থাকা উচিত। তাঁর কর্তব্য সমস্ত জীবের সুহৃদ হওয়া এবং কৃষ্ণভাবনামৃতে অত্যন্ত শান্তচিত্ত থাকা। সন্ন্যাসীর কর্তব্য এইভাবে জীবন অথবা মৃত্যুর পরোয়া না করে, জড় দেহত্যাগের সময়ের প্রতীক্ষা করে, একাকী বিচরণ করা। তাঁর অনাবশ্যক গ্রন্থ পাঠ করা অথবা জ্যোতিষ আদি বৃত্তি গ্রহণ করা উচিত নয়, এবং বাগ্মী হওয়ার চেষ্টা করা উচিত নয়। তাঁর কর্তব্য অনর্থক তর্ক-বিতর্কের পন্থা পরিত্যাগ করা এবং কোন অবস্থাতেই কারও উপর নির্ভর না করা। মানুষকে প্রলোভন দেখিয়ে তাঁর শিষ্য সংখ্যা বৃদ্ধি করার চেষ্টা করা উচিত নয়। জীবিকা অর্জনের জন্য বহু গ্রন্থ পাঠ করার অভ্যাস ত্যাগ করা উচিত, এবং বহু মঠ-মন্দির স্থাপন করার চেষ্টা করা উচিত নয়। সন্ন্যাসী যখন এইভাবে সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র, শান্ত এবং সমচিত্ত হন, তখন তিনি তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর বাঞ্ছিত লক্ষ্য স্থির করে সেই গন্তব্য প্রাপ্ত হতে পারেন। যদিও তিনি সম্পূর্ণরূপে বিজ্ঞ, তবুও তাঁর কর্তব্য মূক ব্যক্তির মতো নীরব থেকে অশান্ত শিশুর মতো বিচরণ করা।

এই প্রসঙ্গে নারদ মুনি আজগর বৃত্তিপরায়ণ এক মহাত্মার সঙ্গে প্রহ্লাদ মহারাজের সাক্ষাতের উপাখ্যান বর্ণনা করেছেন। এইভাবে তিনি পরমহংসের লক্ষণ বর্ণনা

করেছেন। যে ব্যক্তি পরমহংস স্তর প্রাপ্ত হয়েছেন, তিনি জড় পদার্থ এবং চিন্ময় আত্মার পার্থক্য খুব ভালভাবে অবগত। তিনি কখনই জড় ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনে আগ্রহী হন না, কারণ তিনি সর্বদাই ভগবদ্ভক্তি পরায়ণ হওয়ার ফলে আনন্দময়। তিনি কখনই তাঁর জড় শরীর রক্ষার চেষ্টা করেন না। ভগবানের কৃপায় তিনি যা প্রাপ্ত হন, তাতেই তিনি সন্তুষ্ট থাকেন। তিনি সর্বতোভাবে জড় সুখ এবং দুঃখ থেকে স্বতন্ত্র থাকেন, এবং তাই তিনি সমস্ত বিধি-নিষেধের অতীত। কখনও কখনও তিনি কঠোর তপস্যা-পরায়ণ হন, এবং কখনও তিনি জড় ঐশ্বর্য স্বীকার করেন। তাঁর একমাত্র চেষ্টা শ্রীকৃষ্ণের প্রসন্নতা বিধান করা, এবং সেই জন্য তিনি বিধি-নিষেধের অপেক্ষা না করে যে কোন কর্ম করতে প্রস্তুত থাকেন। তাঁকে কখনও একজন সাধারণ জড় বিষয়াসক্ত ব্যক্তির সমকক্ষ বলে মনে করা উচিত নয়, এবং তিনি সেই প্রকার ব্যক্তিদের বিচারের বিষয়ীভূত নন।

শ্লোক ১

শ্রীনারদ উবাচ

কল্পস্ত্বেবং পরিব্রজ্য দেহমাত্রাবশেষিতঃ ।
গ্রামৈকরাত্রবিধিনা নিরপেক্ষশ্চরেন্মহীম্ ॥ ১ ॥

শ্রী-নারদঃ উবাচ—শ্রীনারদ মুনি বললেন; **কল্পঃ**—যে ব্যক্তি সন্ন্যাস-আশ্রমের তপস্যা অথবা দিব্য জ্ঞানের অনুশীলনে সমর্থ; **তু**—কিন্তু; **এবম্**—এইভাবে (পূর্বে যা বর্ণনা করা হয়েছে); **পরিব্রজ্য**—পূর্ণরূপে তাঁর চিন্ময় স্বরূপ উপলব্ধি করে, এক স্থান থেকে আর এক স্থানে বিচরণশীল; **দেহমাত্র**—কেবল দেহটি রেখে; **অবশেষিতঃ**—অবশিষ্ট; **গ্রাম**—একটি গ্রামে; **এক**—কেবল একটি; **রাত্র**—রাত্রি; **বিধিনা**—বিধি অনুসারে; **নিরপেক্ষঃ**—কোন জড় বস্তুর উপর নির্ভর না করে; **চরেৎ**—এক স্থান থেকে আর এক স্থানে বিচরণ করা উচিত; **মহীম্**—পৃথিবীতে।

অনুবাদ

শ্রীনারদ মুনি বললেন—আধ্যাত্মিক জ্ঞান অনুশীলনে সমর্থ ব্যক্তির কর্তব্য, সমস্ত জড় সম্পর্ক পরিত্যাগপূর্বক কেবল তাঁর দেহটি মাত্র অবশিষ্ট রেখে, প্রতি গ্রামে কেবল এক রাত্রি অবস্থান করে, এক স্থান থেকে আর এক স্থানে বিচরণ করা। এইভাবে, সন্ন্যাসীর কর্তব্য দেহের প্রয়োজনের জন্য কারও উপর নির্ভর না করে সারা পৃথিবী ভ্রমণ করা।

শ্লোক ২

বিভৃয়াদ্ যদ্যসৌ বাসঃ কৌপীনাচ্ছাদনং পরম্ ।
ত্যক্তং ন লিঙ্গাদ্ দণ্ডাদেরন্যৎ কিঞ্চিদনাপদি ॥ ২ ॥

বিভৃয়াৎ—ব্যবহার করা উচিত; **যদি**—যদি; **অসৌ**—সন্ন্যাসী; **বাসঃ**—বসন বা আচ্ছাদন; **কৌপীন**—কৌপীন (কেবল গোপন অঙ্গ আচ্ছাদন করার জন্য); **আচ্ছাদনম্**—আচ্ছাদন করার জন্য; **পরম্**—কেবল ততটুকু; **ত্যক্তম্**—ত্যাগ করে; **ন**—না; **লিঙ্গাৎ**—সন্ন্যাসীর চিহ্ন থেকে; **দণ্ড-আদেঃ**—ত্রিদণ্ড আদি; **অন্যৎ**—অন্য; **কিঞ্চিৎ**—কোন কিছু; **অনাপদি**—আপদ ব্যতিরেকে সাধারণ সময়ে।

অনুবাদ

সন্ন্যাসীর কেবল দেহ আচ্ছাদনের জন্যও বসন পরিধানের চেষ্টা করা উচিত নয়। তিনি যদি কোন কিছু পরিধান করেনও, তা হলে কেবলমাত্র কৌপীনই পরিধান করা উচিত, এবং প্রয়োজন না হলে দণ্ডও গ্রহণ করা উচিত নয়। কেবল দণ্ড এবং কমণ্ডলু ছাড়া সন্ন্যাসীর অন্য কিছু বহন করা উচিত নয়।

শ্লোক ৩

এক এব চরেদ্ ভিক্ষুরাত্মারামোঽনপাশ্রয়ঃ ।
সর্বভূতসুহৃচ্ছান্তো নারায়ণপরায়ণঃ ॥ ৩ ॥

একঃ—একলা; **এব**—কেবল; **চরেৎ**—বিচরণ করতে পারেন; **ভিক্ষুঃ**—ভিক্ষা গ্রহণকারী সন্ন্যাসী; **আত্ম-আরামঃ**—পূর্ণরূপে আত্মতৃপ্ত; **অনপাশ্রয়ঃ**—কোন কিছুর উপর নির্ভর না করে; **সর্ব-ভূত-সুহৃৎ**—সমস্ত জীবের শুভাকাঙ্ক্ষী হয়ে; **শান্তঃ**—পূর্ণরূপে শান্ত; **নারায়ণ-পরায়ণঃ**—নারায়ণের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে এবং তাঁর ভক্ত হয়ে।

অনুবাদ

সন্ন্যাসী আত্মারাম, ভিক্ষা তাঁর উপজীবিকা, তিনি কোন স্থান অথবা ব্যক্তির উপর নির্ভর করেন না, তিনি সমস্ত জীবের সুহৃদ, শান্ত এবং নারায়ণের অনন্য ভক্ত। সন্ন্যাসীর কর্তব্য, এইভাবে এক স্থান থেকে আর এক স্থানে বিচরণ করা।

শ্লোক ৪

পশ্যেদাত্মন্যদো বিশ্বং পরে সদসতোঽব্যয়ে ।
আত্মানং চ পরং ব্রহ্ম সর্বত্র সদসন্ময়ে ॥ ৪ ॥

পশ্যেৎ—দেখা উচিত; **আত্মনি**—পরমাত্মায়; **অদঃ**—এই; **বিশ্বম্**—ব্রহ্মাণ্ড; **পরে**—অতীত; **সৎ-অসতঃ**—সৃষ্টি বা সৃষ্টির কারণ; **অব্যয়ে**—অব্যয় পরম ব্রহ্মে; **আত্মানম্**—স্বয়ং; **চ**—ও; **পরম্**—পরম; **ব্রহ্ম**—ব্রহ্মে; **সর্বত্র**—সর্বত্র; **সৎ-অসৎ**—কারণ এবং কার্যে; **ময়ে**—সর্বব্যাপ্ত।

অনুবাদ

সন্ন্যাসীর কর্তব্য পরম ব্রহ্মকে প্রত্যেক বস্তুতে ব্যাপ্তরূপে দর্শন করার চেষ্টা করা এবং ব্রহ্মাণ্ড সহ সমস্ত বস্তুকে পরব্রহ্মে আশ্রিতরূপে দর্শন করা।

শ্লোক ৫

সুপ্তিপ্রবোধয়োঃ সন্ধাবাত্মনো গতিমাত্মদৃক্ ।
পশ্যন্ বন্ধং চ মোক্ষং চ মায়ামাত্রং ন বস্তুতঃ ॥ ৫ ॥

সুপ্তি—অচেতন অবস্থায়; **প্রবোধয়োঃ**—এবং চেতন অবস্থায়; **সন্ধৌ**—সন্ধি সময়ে; **আত্মনঃ**—আত্মার; **গতিম্**—গতি; **আত্ম-দৃক্**—যিনি প্রকৃতপক্ষে আত্মাকে দর্শন করতে পারেন; **পশ্যন্**—সর্বদা দর্শন করার অথবা হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা করে; **বন্ধম্**—বদ্ধ জীবন; **চ**—এবং; **মোক্ষম্**—জীবনের মুক্ত অবস্থা; **চ**—ও; **মায়া-মাত্রম্**—কেবলমাত্র মায়া; **ন**—না; **বস্তুতঃ**—প্রকৃতপক্ষে।

অনুবাদ

অচেতন, চেতন এবং এই দুইয়ের মধ্যবর্তী অবস্থায়, সন্ন্যাসীর কর্তব্য আত্মাতে অবস্থিত হয়ে, আত্মতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করে, বন্ধন এবং মুক্তিকে মায়ামাত্র ও অবাস্তব বলে বিবেচনা করা। এই প্রকার উন্নত উপলব্ধি প্রাপ্ত হয়ে, পরম ব্রহ্মকে সর্ব-ব্যাপ্তরূপে দর্শন করা উচিত।

তাৎপর্য

সুষুপ্তি অজ্ঞান, অন্ধকার অথবা জড় জগতের অতিরিক্ত আর কিছুই নয়, এবং চেতন অবস্থা হচ্ছে জাগরণ। এই সুষুপ্তি এবং জাগরণের মধ্যবর্তী অবস্থার কোন স্থায়ী

অস্তিত্ব নেই। তাই যিনি আত্ম-তত্ত্ববেত্তা তিনি জানেন যে, সুষুপ্তি এবং জাগরণ উভয়ই মায়া মাত্র, কারণ মূলত তাদের অস্তিত্ব নেই। পরম ব্রহ্মেরই কেবল অস্তিত্ব রয়েছে। সেই কথা *ভগবদ্গীতায়* (৯/৪) প্রতিপন্ন হয়েছে—

ময়া ততমিদং সর্বং জগদব্যক্তমূর্তিনা ।
মৎস্থানি সর্বভূতানি ন চাহং তেষ্ববস্থিতঃ ॥

"অব্যক্তরূপে আমি সমস্ত জগতে ব্যাপ্ত আছি। সমস্ত জীব আমাতেই অবস্থিত, কিন্তু আমি তাতে অবস্থিত নই।" শ্রীকৃষ্ণের নির্বিশেষ রূপে সব কিছুর অস্তিত্ব বিদ্যমান; শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত কোন কিছুরই অস্তিত্ব থাকতে পারে না। তাই শ্রীকৃষ্ণের উত্তম ভক্ত সর্বদাই মোহমুক্ত হয়ে ভগবানকে দর্শন করেন।

শ্লোক ৬

নাভিনন্দেদ্ ধ্রুবং মৃত্যুমধ্রুবং বাস্য জীবিতম্ ।
কালং পরং প্রতীক্ষেত ভূতানাং প্রভবাপ্যয়ম্ ॥ ৬ ॥

ন—না; **অভিনন্দেৎ**—অভিনন্দন করা উচিত; **ধ্রুবম্**—নিশ্চিত; **মৃত্যুম্**—মৃত্যু; **অধ্রুবম্**—অনিশ্চিত; **বা**—অথবা; **অস্য**—এই দেহের; **জীবিতম্**—জীবনকে; **কালম্**—নিত্য কাল; **পরম্**—পরম; **প্রতীক্ষেত**—প্রতীক্ষা করা কর্তব্য; **ভূতানাম্**—জীবদের; **প্রভব**—প্রকাশ; **অপ্যয়ম্**—তিরোধান।

অনুবাদ

যেহেতু জড় দেহের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী এবং জীবন অনিশ্চিত, তাই জীবন অথবা মৃত্যু কোনটিরই অভিনন্দন করা উচিত নয়। পক্ষান্তরে, নিত্য কালকে অবলোকন করা উচিত, যাতে জীবের আবির্ভাব এবং তিরোভাব হয়।

তাৎপর্য

এই জড় জগতে সমস্ত জীব কেবল বর্তমান সময়েই নয়, অতীতেও জন্ম-মৃত্যুর সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করেছে। কেউ মৃত্যুর উপর গুরুত্ব দিয়ে সব কিছুকে মায়িক বলে বর্ণনা করে; আর যারা জীবনের ওপর গুরুত্ব দেয়, তারা জীবনকে চিরকাল আঁকড়ে ধরে রেখে এই জড় জগৎকে যথাসাধ্য ভোগ করার প্রচেষ্টা করে। তারা উভয়েই মূর্খ। জড় দেহের আবির্ভাব এবং অন্তর্ধানের কারণ কালকে ভালভাবে নিরীক্ষণ করতে, এবং কালের প্রভাবে জীবের বন্ধন দর্শন করতে মানুষকে

উপদেশ দেওয়া হয়েছে। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাই *গীতাবলীতে* গেয়েছেন—

অনাদি করম-ফলে, পড়ি' ভবার্ণব-জলে,
তরিবারে না দেখি উপায়।

জন্ম ও মৃত্যুর কারণস্বরূপ কালের কার্যকলাপ নিরীক্ষণ করা উচিত। এই সৃষ্টির পূর্বে জীবেরা কালের অধীন ছিল, এবং কালের মধ্যে জড় জগতের প্রকাশ হয় এবং লয় হয়। *ভূত্বা ভূত্বা প্রলীয়তে*। কালের নিয়ন্ত্রণাধীন হওয়ার ফলে ,জন্ম-জন্মান্তরে জীবের আবির্ভাব হয় এবং তিরোধান হয়। এই কাল ভগবানের নির্বিশেষ প্রকাশ, যিনি জড়া প্রকৃতির বন্ধনে আবদ্ধ জীবদের তাঁর শরণাগত হওয়ার মাধ্যমে এই জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার সুযোগ দেন।

শ্লোক ৭

নাসচ্ছাস্ত্রেষু সজ্জেত নোপজীবেত জীবিকাম্।
বাদবাদাংস্ত্যজেৎ তর্কান্ পক্ষং কং চ ন সংশ্রয়েৎ ॥ ৭ ॥

ন—না; **অসৎ-শাস্ত্রেষু**—খবরের কাগজ, উপন্যাস, নাটক, গল্প আদি সাহিত্য; **সজ্জেত**—আসক্ত হওয়া বা পাঠ করা উচিত; **ন**—না; **উপজীবেত**—জীবন ধারণ করার চেষ্টা করা উচিত; **জীবিকাম্**—জীবিকার দ্বারা; **বাদ-বাদান্**—দর্শনের বিভিন্ন বিষয়ে অনর্থক বাক্‌বিতণ্ডা করা; **ত্যজেৎ**—ত্যাগ করা উচিত; **তর্কান্**—তর্ক-বিতর্ক; **পক্ষম্**—পক্ষ; **কং চ**—কোন; **ন**—না; **সংশ্রয়েৎ**—আশ্রয় গ্রহণ করা উচিত।

অনুবাদ

যে সমস্ত সাহিত্য কেবল অনর্থক সময়ের অপচয়ের জন্য পাঠ করা হয়, অর্থাৎ, যে সমস্ত গ্রন্থ পাঠে আধ্যাত্মিক লাভ হয় না, সেই সমস্ত গ্রন্থ ত্যাগ করা উচিত। জীবিকা নির্বাহের জন্য পেশাদারি শিক্ষক হওয়া উচিত নয়, এবং বৃথা তর্ক-বির্তকে লিপ্ত হওয়া উচিত নয়। কোন পক্ষ আশ্রয় করাও উচিত নয়।

তাৎপর্য

যে ব্যক্তি পারমার্থিক উন্নতি সাধনে অভিলাষী, তার সাধারণ গল্প, উপন্যাস পাঠ করা উচিত নয়। এই পৃথিবী এই ধরনের গ্রাম্য সাহিত্যে পূর্ণ, যা অনর্থক মনকে বিচলিত করে। খবরের কাগজ, নাটক, উপন্যাস ইত্যাদি সাহিত্য আধ্যাত্মিক জ্ঞানের

উন্নতি সাধনের জন্য নয়। প্রকৃতপক্ষে সেগুলিকে কাকের আনন্দ উপভোগের স্থান (*তদ্বায়সং তীর্থম্*) বলে বর্ণনা করা হয়েছে। যে ব্যক্তি আধ্যাত্মিক জ্ঞানের উন্নতি সাধন করতে চান, তাঁর অবশ্য কর্তব্য এই ধরনের সাহিত্য বর্জন করা। বিভিন্ন দার্শনিক সিদ্ধান্ত বা তর্ক-বিতর্কেও লিপ্ত হওয়া উচিত নয়। যারা ভগবানের বাণী প্রচার করেন, তাঁদের অবশ্য কখনও কখনও বিরুদ্ধ পক্ষকে পরাস্ত করার জন্য তর্ক-বিতর্ক করতে হয়, কিন্তু যতদূর সম্ভব তার্কিক মনোভাব বর্জন করা উচিত। এই প্রসঙ্গে শ্রীল মধ্বাচার্য বলেছেন—

অপ্রয়োজনপক্ষং ন সংশ্রয়েৎ ।
নাপ্রয়োজনপক্ষী স্যান্ন বৃথা শিষ্যবন্ধকৃৎ ।
ন চোদাসীনঃ শাস্ত্রাণি ন বিরুদ্ধানি চাভ্যসেৎ ॥
ন ব্যাখ্যয়োপজীবেত ন নিষিদ্ধান্ সমাচরেৎ ।
এবম্ভূতো যতির্যাতি তদেকশরণো হরিম্ ॥

"অপ্রয়োজনীয় শাস্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ করা উচিত নয় অথবা তথাকথিত দার্শনিক এবং মননশীল ব্যক্তিরা যারা আধ্যাত্মিক জীবনে উন্নতি সাধনে কোন রকম সাহায্য করতে পারে না, তাদের শরণ গ্রহণ করা উচিত নয়। জনপ্রিয়তা লাভের জন্য বহু শিষ্য সংগ্রহ করা উচিত নয়। এই ধরনের তথাকথিত শাস্ত্রের স্বপক্ষ বা বিপক্ষ অবলম্বন না করে উদাসীন থাকা উচিত, এবং শাস্ত্র বিশ্লেষণ করার দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করা উচিত নয়। সন্ন্যাসীর কর্তব্য সর্বদা নিরপেক্ষ থেকে সর্বতোভাবে ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় অবলম্বন করে, আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনের উপায় অন্বেষণ করা।

শ্লোক ৮

ন শিষ্যাননুবধ্নীত গ্রন্থান্ নৈবাভ্যসেদ্ বহূন্ ।
ন ব্যাখ্যামুপযুঞ্জীত নারম্ভানারভেৎ ক্বচিৎ ॥ ৮ ॥

ন—না; **শিষ্যান্**—শিষ্য; **অনুবধ্নীত**—প্রলোভনের দ্বারা সংগ্রহ করা; **গ্রন্থান্**—অর্থহীন সাহিত্য; **ন**—না; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **অভ্যসেৎ**—বুঝতে অথবা অনুশীলন করতে চেষ্টা করা; **বহূন্**—বহু; **ন**—না; **ব্যাখ্যাম্**—ব্যাখ্যা; **উপযুঞ্জীত**—জীবিকা উপার্জনের উপায় স্বরূপ; **ন**—না; **আরম্ভান্**—অনাবশ্যক ঐশ্বর্য; **আরভেৎ**—বৃদ্ধি করার চেষ্টা করা উচিত; **ক্বচিৎ**—কোন সময়ে।

অনুবাদ

প্রলোভন আদির দ্বারা বহু শিষ্য সংগ্রহ করা সন্ন্যাসীর উচিত নয়, অনর্থক বহু গ্রন্থ পাঠ করা উচিত নয় এবং শাস্ত্রগ্রন্থ ব্যাখ্যা করার দ্বারা জীবিকা উপার্জন করা উচিত নয়। তাঁর পক্ষে অনর্থক জড় ঐশ্বর্য বৃদ্ধির কোন প্রয়াস করা উচিত নয়।

তাৎপর্য

তথাকথিত স্বামী এবং যোগীরা সাধারণত জড়-জাগতিক লাভের প্রলোভন দেখিয়ে শিষ্য সংগ্রহ করে। তথাকথিত বহু গুরু রয়েছে, যারা রোগ সারাবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে অথবা একটু-আধটু সোনা তৈরি করে জড় ঐশ্বর্য বৃদ্ধি করার প্রলোভন দেখিয়ে শিষ্যদের আকৃষ্ট করে। এই ধরনের টাকা-পয়সার প্রলোভন বুদ্ধিহীন মূর্খ মানুষদের জন্য। এই ধরনের জড়-জাগতিক প্রলোভনের দ্বারা শিষ্য সংগ্রহ করা সন্ন্যাসীর পক্ষে সর্বতোভাবে বর্জিত। সন্ন্যাসীরা কখনও কখনও অনর্থক বহু মঠ-মন্দির নির্মাণ করার চেষ্টা করে জড় ঐশ্বর্যে লিপ্ত হয়, কিন্তু এই ধরনের প্রয়াস বর্জন করা উচিত। আধ্যাত্মিক চেতনা বা কৃষ্ণভক্তি প্রচার করার জন্যই কেবল মঠ-মন্দির তৈরি করা উচিত, জড়-জাগতিক এবং আধ্যাত্মিক উভয় ক্ষেত্রেই অপদার্থ ব্যক্তিদের বিনা পয়সায় থাকা-খাওয়ার হোটেল তৈরি করার জন্য নয়। মন্দির এবং মঠগুলি যাতে উন্মাদ ব্যক্তিদের আড্ডাখানায় পরিণত না হয়, সেই সম্পর্কে সচেতন থাকা কর্তব্য। আমাদের কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনে আমরা সকলকে আহ্বান করি যদি তারা অন্ততপক্ষে অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ, আসব পান, আমিষ আহার এবং দ্যূতক্রীড়া বর্জন করতে সম্মত থাকে। মন্দিরে এবং মঠে অকর্মণ্য, পরিত্যক্ত এবং অলস ব্যক্তিদের সমাবেশ কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। মঠ-মন্দিরগুলির ব্যবহার কেবল কৃষ্ণভাবনায় আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনে নিষ্ঠাপরায়ণ ভক্তদের জন্যই হওয়া উচিত। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর *আরম্ভান্* শব্দটির বিশ্লেষণ করে বলেছেন *মঠাদিব্যাপারান্*, অর্থাৎ 'মঠ-মন্দির নির্মাণ করার চেষ্টা'। সন্ন্যাসীর প্রথম কর্তব্য হচ্ছে কৃষ্ণভক্তির প্রচার। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় যদি সুযোগ-সুবিধা লাভ হয়, তা হলে কৃষ্ণভক্তি অনুশীলনে আগ্রহী সাধকদের আশ্রয় প্রদান করার জন্য মঠ-মন্দির তৈরি করা যেতে পারে। তা না হলে এই ধরনের মঠ-মন্দিরের কোন প্রয়োজন হয় না।

শ্লোক ৯

ন যতেরাশ্রমঃ প্রায়ো ধর্মহেতুর্মহাত্মনঃ ।
শান্তস্য সমচিত্তস্য বিভৃয়াদুত বা ত্যজেৎ ॥ ৯ ॥

ন—না; **যতেঃ**—সন্ন্যাসীর; **আশ্রমঃ**—আশ্রমের চিহ্ন সমন্বিত বেশ (দণ্ড এবং কমণ্ডলু সহ); **প্রায়ঃ**—প্রায় সর্বদা; **ধর্মহেতুঃ**—আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনের কারণ; **মহা-আত্মনঃ**—যে ব্যক্তি প্রকৃতই মহাত্মা; **শান্তস্য**—শান্ত; **সম-চিত্তস্য**—সমদর্শী; **বিভৃয়াৎ**—(এই ধরনের চিহ্ন) গ্রহণ করতে পারেন; **উত**—বস্তুতপক্ষে; **বা**—অথবা; **ত্যজেৎ**—ত্যাগ করতে পারেন।

অনুবাদ

আধ্যাত্মিক চেতনায় প্রকৃতই উন্নত, শান্ত এবং সমদর্শী ব্যক্তির ত্রিদণ্ড, কমণ্ডলু আদি সন্ন্যাস আশ্রমের চিহ্ন ধারণ করার প্রয়োজন হয় না। আবশ্যকতা অনুসারে তিনি কখনও কখনও সেই চিহ্নগুলি ধারণ করতে পারেন এবং কখনও বর্জন করতে পারেন।

তাৎপর্য

সন্ন্যাস আশ্রমের চারটি স্তর রয়েছে—কুটীচক, বহূদক, পরিব্রাজকাচার্য এবং পরমহংস। এখানে *শ্রীমদ্ভাগবতে*, সন্ন্যাসীদের মধ্যে পরমহংস স্তরের বিচার করা হয়েছে। মায়াবাদী সন্ন্যাসীরা কখনও পরমহংস স্তর লাভ করতে পারে না। তার কারণ হচ্ছে পরমতত্ত্ব সম্বন্ধে তাদের নির্বিশেষ ধারণা। *ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে*। অদ্বয়তত্ত্ব তিনটি স্তরে উপলব্ধ হয়, যার মধ্যে ভগবৎ উপলব্ধি পরমহংসদের জন্য। বস্তুতপক্ষে, *শ্রীমদ্ভাগবত* পরমহংসদের জন্য (*পরমো নির্মৎসরাণাং সতাম্*)। পরমহংস না হলে, *শ্রীমদ্ভাগবতের* তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করার যোগ্য হওয়া যায় না। পরমহংস বা বৈষ্ণব সন্ন্যাসীদের প্রথম কর্তব্য হচ্ছে ভগবানের বাণী প্রচার করা। এই বাণী প্রচারের জন্য সন্ন্যাসীদের কখনও কখনও সন্ন্যাস আশ্রমের চিহ্ন, যেমন দণ্ড এবং কমণ্ডলু ধারণ করতে হয়, আবার কখনও তারা তা ধারণ নাও করতে পারেন। সাধারণত পরমহংস হওয়ার ফলে, বৈষ্ণব-সন্ন্যাসীদের বাবাজী বলা হয়, এবং তাদের দণ্ড ও কমণ্ডলু বহন করতে হয় না। এই প্রকার সন্ন্যাসীদের সন্ন্যাস আশ্রমের চিহ্ন গ্রহণ করার অথবা বর্জন করার স্বাধীনতা রয়েছে। তার একমাত্র চিন্তা, "কোথায় কৃষ্ণভক্তি প্রচার করার সুযোগ

রয়েছে?" কখনও কখনও কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন তার প্রতিনিধি সন্ন্যাসীদের বিভিন্ন দেশে পাঠায়, যেখানে দণ্ড এবং কমণ্ডলু লোকেরা পছন্দ করে না। তাই তারা আমাদের গ্রন্থ বিতরণ করার জন্য এবং দর্শন প্রচার করার জন্য সাধারণ পোশাকে সেখানে যায়। আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে কৃষ্ণভক্তির পথে মানুষকে আকৃষ্ট করা। তা আমরা সন্ন্যাসীর পোশাক পরে অথবা সাধারণ ভদ্রলোকের পোশাক পরে করতে পারি। আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে কৃষ্ণভক্তি প্রচার করা।

শ্লোক ১০

অব্যক্তলিঙ্গো ব্যক্তার্থো মনীষ্যুন্মত্তবালবৎ ।
কবির্মূকবদাত্মানং স দৃষ্ট্যা দর্শয়েন্নৃণাম্ ॥ ১০ ॥

অব্যক্ত-লিঙ্গঃ—যাঁর সন্ন্যাসের চিহ্নগুলি ব্যক্ত নয়; **ব্যক্ত-অর্থঃ**—যাঁর উদ্দেশ্য ব্যক্ত; **মনীষী**—এই প্রকার মহাপুরুষ; **উন্মত্ত**—উন্মত্ত; **বালবৎ**—একটি বালকের মতো; **কবিঃ**—মহান কবি অথবা বাগ্মী; **মূকবৎ**—মূক ব্যক্তির মতো; **আত্মানম্**—নিজেকে; **সঃ**—তিনি; **দৃষ্ট্যা**—দৃষ্টান্তের দ্বারা; **দর্শয়েৎ**—প্রদর্শন করবেন; **নৃণাম্**—মানব-সমাজের কাছে।

অনুবাদ

সাধু ব্যক্তি মানব-সমাজের কাছে নিজেকে প্রকাশ না করলেও, তাঁর আচরণের দ্বারা তাঁর উদ্দেশ্য প্রকাশিত হয়। তিনি মনীষী হলেও উন্মত্ত বালকের মতো এবং বাগ্মী হলেও মূকবৎ মানব-সমাজের কাছে নিজেকে প্রদর্শন করেন।

তাৎপর্য

কৃষ্ণভাবনায় অত্যন্ত উন্নত মহাপুরুষ সন্ন্যাসীর চিহ্নের দ্বারা নিজেকে প্রকাশ নাও করতে পারেন। তাঁর পরিচয় গোপন রাখার জন্য তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ মনীষী এবং বাগ্মী হওয়া সত্ত্বেও, উন্মত্ত শিশুর মতো অথবা মূক ব্যক্তির মতো আচরণ করেন।

শ্লোক ১১

অত্রাপ্যুদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্ ।
প্রহ্লাদস্য চ সংবাদং মুনেরাজগরস্য চ ॥ ১১ ॥

অত্র—এখানে; **অপি**—জনসাধারণের চক্ষে প্রকট না হলেও; **উদাহরন্তি**—পণ্ডিতেরা একটি উদাহরণ দেন; **ইমম্**—এই; **ইতিহাসম্**—ঐতিহাসিক ঘটনা; **পুরাতনম্**—অতি প্রাচীন; **প্রহ্লাদস্য**—প্রহ্লাদ মহারাজের; **চ**—ও; **সংবাদম্**—কথোপকথন; **মুনেঃ**—এক মহান সাধু পুরুষের; **আজগরস্য**—যিনি অজগরের বৃত্তি গ্রহণ করেছেন; **চ**—ও।

অনুবাদ

এই বিষয়ে পণ্ডিতেরা প্রহ্লাদ মহারাজ এবং আজগর বৃত্তি অবলম্বনকারী এক মহাত্মার আলোচনা বিষয়ক একটি অতি প্রাচীন ইতিহাস দৃষ্টান্তস্বরূপ বলে থাকেন।

তাৎপর্য

প্রহ্লাদ মহারাজের সঙ্গে আজগর বৃত্তি অবলম্বনকারী এক মহাত্মার সাক্ষাৎ হয়েছিল। তিনি কোন স্থানে না গিয়ে এক স্থানে বছরের পর বছর বসেছিলেন এবং আপনা থেকেই যা লাভ হত তাই তিনি আহার করতেন। প্রহ্লাদ মহারাজ তাঁর অনুচরগণ সহ এই মহাত্মার সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন এবং তাঁর সঙ্গে এইভাবে আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন।

শ্লোক ১২-১৩

তং শয়ানং ধরোপস্থে কাবের্যাং সহ্যসানুনি ।
রজস্বলৈস্তনূদেশৈর্নিগূঢ়ামলতেজসম্ ॥ ১২ ॥
দদর্শ লোকান্ বিচরন্ লোকতত্ত্ববিবিৎসয়া ।
বৃতোঽমাত্যৈঃ কতিপয়ৈঃ প্রহ্লাদো ভগবৎপ্রিয়ঃ ॥ ১৩ ॥

তম্—সেই (মহাত্মা); **শয়ানম্**—শায়িত; **ধরা-উপস্থে**—মাটিতে; **কাবের্যাম্**—কাবেরী নদীর তীরে; **সহ্য-সানুনি**—সহ্য পর্বতের তটে; **রজঃ-বলৈঃ**—ধূলিধূসরিত; **তনূ-দেশৈঃ**—তার সারা দেহ; **নিগূঢ়**—অত্যন্ত গভীর; **অমল**—নির্মল; **তেজসম্**—আধ্যাত্মিক শক্তি; **দদর্শ**—তিনি দেখেছিলেন; **লোকান্**—বিভিন্ন লোকে; **বিচরণ**—ভ্রমণ করে; **লোক-তত্ত্ব**—জীবের প্রকৃতি (বিশেষ করে যাঁরা কৃষ্ণভাবনায় উন্নতি সাধনে চেষ্টাশীল); **বিবিৎসয়া**—বোঝার চেষ্টা করে; **বৃতঃ**—পরিবৃত; **অমাত্যৈঃ**—রাজকীয় পার্ষদদের দ্বারা; **কতিপয়ৈঃ**—কয়েকজন; **প্রহ্লাদঃ**—প্রহ্লাদ মহারাজ; **ভগবৎ-প্রিয়ঃ**—যিনি ভগবানের অত্যন্ত প্রিয়।

অনুবাদ

ভগবানের পরম প্রিয় সেবক প্রহ্লাদ মহারাজ এক সময় তাঁর কয়েকজন অন্তরঙ্গ পার্ষদ পরিবৃত হয়ে, মহাত্মাদের প্রকৃতি অধ্যয়ন করার বাসনায় ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত লোকে বিচরণ করতে লাগলেন। এইভাবে তিনি কাবেরী নদীর তীরে সহ্য পর্বতের ধরাপৃষ্ঠে এসে উপনীত হন। সেখানে তিনি শায়িত এক মহাত্মাকে দর্শন করেন, যাঁর দেহ ধূলি-ধূসরিত হলেও আধ্যাত্মিক চেতনায় যিনি ছিলেন অত্যন্ত উন্নত।

শ্লোক ১৪

কর্মণাকৃতিভির্বাচা লিঙ্গৈর্বর্ণাশ্রমাদিভিঃ ।
ন বিদন্তি জনা যং বৈ সোঽসাবিতি নবেতি চ ॥ ১৪ ॥

কর্মণা—কার্যকলাপের দ্বারা; **আকৃতিভিঃ**—আকৃতির দ্বারা; **বাচা**—বাক্যের দ্বারা; **লিঙ্গৈঃ**—লক্ষণের দ্বারা; **বর্ণাশ্রম**—বর্ণ এবং আশ্রম সম্পর্কিত; **আদিভিঃ**—এবং অন্যান্য লক্ষণের দ্বারা; **ন বিদন্তি**—জানা যায় না; **জনাঃ**—জনসাধারণ; **যম্**—যাঁকে; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **সঃ**—সেই ব্যক্তি কি না; **অসৌ**—এই ব্যক্তি; **ইতি**—এইভাবে; **ন**—না; **বা**—অথবা; **ইতি**—এইভাবে; **চ**—ও।

অনুবাদ

সেই মহাত্মার কার্যকলাপ, দেহের আকৃতি, বাক্য এবং বর্ণাশ্রম আদির চিহ্ন দ্বারা মানুষ বুঝতে পারেনি ইনিই তাদের সেই পরিচিত ব্যক্তিটি কি না।

তাৎপর্য

সহ্যাদ্রির উপত্যকায় কাবেরী নদীর তীরে সেই বিশেষ স্থানটির অধিবাসীরা বুঝতে পারেনি সেই মহাপুরুষটি তাদের পরিচিত সেই ব্যক্তিটি কি না। তাই বলা হয়, *বৈষ্ণবের ক্রিয়া-মুদ্রা বিজ্ঞেহ না বুঝয়।* অতি উন্নত স্তরের বৈষ্ণব এমনভাবে থাকেন যে, কেউই বুঝতে পারে না তিনি কে অথবা তিনি কি। বৈষ্ণবের অতীত বোঝার চেষ্টা করা উচিত নয়। প্রহ্লাদ মহারাজ সেই মহাত্মার বিগত জীবন সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন না করে, তৎক্ষণাৎ তাঁকে সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করেছিলেন।

শ্লোক ১৫

তং নত্বাভ্যর্চ্য বিধিবৎ পাদয়োঃ শিরসা স্পৃশন্ ।
বিবিৎসুরিদমপ্রাক্ষীন্মহাভাগবতোঽসুরঃ ॥ ১৫ ॥

তম্—তাঁকে (মহাত্মাকে); **নত্বা**—প্রণতি নিবেদন করে; **অভ্যর্চ্য**—এবং পূজা করে; **বিধিবৎ**—শিষ্টাচারের নিয়ম অনুসারে; **পাদয়োঃ**—সেই মহাত্মার চরণকমল; **শিরসা**—তাঁর মস্তকের দ্বারা; **স্পৃশন্**—স্পর্শ করে; **বিবিৎসুঃ**—সেই মহাত্মা সম্বন্ধে জানবার বাসনায়; **ইদম্**—এই; **অপ্রাক্ষীৎ**—প্রশ্ন করেছিলেন; **মহা-ভাগবতঃ**—ভগবানের মহান ভক্ত; **অসুরঃ**—অসুরকুলে জন্ম হওয়া সত্ত্বেও।

অনুবাদ

মহাভাগবত প্রহ্লাদ মহারাজ আজগর বৃত্তিপরায়ণ সেই মহাত্মাকে পূজা করেছিলেন, এবং তাঁর মস্তক দ্বারা তাঁর চরণকমল স্পর্শপূর্বক প্রণতি নিবেদন করে, তাঁকে জানার উদ্দেশ্যে অত্যন্ত বিনীতভাবে এই প্রশ্নগুলি করেছিলেন।

শ্লোক ১৬-১৭

বিভর্ষি কায়ং পীবানং সোদ্যমো ভোগবান্ যথা ॥ ১৬ ॥
বিত্তং চৈবোদ্যমবতাং ভোগো বিত্তবতামিহ ।
ভোগিনাং খলু দেহোঽয়ং পীবা ভবতি নান্যথা ॥ ১৭ ॥

বিভর্ষি—আপনি ধারণ করছেন; **কায়ম্**—দেহ; **পীবানম্**—স্থূল; **স-উদ্যমঃ**—উদ্যমশীল; **ভোগবান্**—ভোগী; **যথা**—যেমন; **বিত্তম্**—ধন; **চ**—ও; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **উদ্যমবতাম্**—আর্থিক উন্নতি সাধনে লিপ্ত ব্যক্তির মতো; **ভোগঃ**—ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধন; **বিত্তবতাম্**—ধনী ব্যক্তির মতো; **ইহ**—এই পৃথিবীতে; **ভোগিনাম্**—ভোগীদের, কর্মীদের; **খলু**—বস্তুতপক্ষে; **দেহঃ**—দেহ; **অয়ম্**—এই; **পীবা**—অত্যন্ত স্থূল; **ভবতি**—হয়; **ন**—না; **অন্যথা**—নতুবা।

অনুবাদ

সেই মহাত্মাকে স্থূলকায় দর্শন করে প্রহ্লাদ মহারাজ জিজ্ঞাসা করেছিলেন—হে মহাশয়, আপনি আপনার জীবিকা অর্জনের কোন চেষ্টা করেন না অথচ আপনি ভোগী ব্যক্তির মতো স্থূল দেহ ধারণ করেছেন। আমি জানি যে, যারা অত্যন্ত

ধনবান এবং যাদের কিছুই করার নেই, তারাই খেয়ে এবং ঘুমিয়ে অত্যন্ত স্থূল দেহ প্রাপ্ত হয়।

তাৎপর্য

কালক্রমে শিষ্য অত্যন্ত মোটা হলে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর তা পছন্দ করতেন না। তাঁর স্থূল শিষ্যদের ভোগী হতে দেখে তিনি অত্যন্ত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হতেন। প্রহ্লাদ মহারাজের উক্তিতেও সেই মনোভাব প্রতিপন্ন হয়েছে। তিনি আজগর বৃত্তিপরায়ণ মহাত্মাকে অত্যন্ত স্থূলকায় দর্শন করে আশ্চর্যান্বিত হয়েছিলেন। জড় জগতেও আমরা সাধারণত দেখতে পাই, কৃশকায় দরিদ্র ব্যক্তি ব্যবসা এবং অন্য কোন উপায়ে যখন ধন সংগ্রহ করে, তখন সে প্রাণভরে ইন্দ্রিয়-সুখ উপভোগ করে এবং তার ফলে স্থূলকায় হয়ে যায়। তাই আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনের পক্ষে স্থূলকায় হওয়া মোটেই সন্তোষজনক নয়।

শ্লোক ১৮

ন তে শয়ানস্য নিরুদ্যমস্য
ব্রহ্মন্ নু হার্থো যত এব ভোগঃ ।
অভোগিনোঽয়ং তব বিপ্র দেহঃ
পীবা যতস্তদ্বদ নঃ ক্ষমং চেৎ ॥ ১৮ ॥

ন—না; **তে**—আপনার; **শয়ানস্য**—শায়িত; **নিরুদ্যমস্য**—নিরুদ্যম; **ব্রহ্মন্**—হে মহাত্মা; **নু**—বস্তুতপক্ষে; **হ**—স্পষ্ট; **অর্থঃ**—ধন; **যতঃ**—যা থেকে; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **ভোগঃ**—ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ; **অভোগিনঃ**—যে ব্যক্তি ভোগপরায়ণ নন; **অয়ম্**—এই; **তব**—আপনার; **বিপ্র**—হে বিদ্বান ব্রাহ্মণ; **দেহঃ**—দেহ; **পীবা**—স্থূল; **যতঃ**—কিভাবে; **তৎ**—এই তথ্য; **বদ**—দয়া করে বলুন; **নঃ**—আমাদের; **ক্ষমম্**—ক্ষমা করুন; **চেৎ**—আমি যদি কোন অশালীন প্রশ্ন করে থাকি।

অনুবাদ

হে পূর্ণ দিব্যজ্ঞান সমন্বিত ব্রাহ্মণ, আপনার কিছুই করণীয় নেই এবং তাই আপনি শায়িত। আপনার ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের জন্য অর্থও নেই। তা হলে ভোগরহিত আপনার দেহ এত স্থূল হল কি করে? আমার এই প্রশ্ন যদি অশালীন না হয়ে থাকে, তা হলে আপনি দয়া করে আমাকে বলুন তা হল কি করে।

তাৎপর্য

যাঁরা সাধারণত পারমার্থিক উন্নতি সাধনে যত্নবান, তাঁরা কেবল একবারই আহার করেন, দুপুরে কিংবা সন্ধ্যায়। কেউ যদি কেবলমাত্র একবার আহার করেন, তা হলে তিনি স্বভাবতই স্থূল হতে পারেন না। কিন্তু সেই তত্ত্বজ্ঞানী ঋষি বেশ স্থূলকায় ছিলেন এবং তাই প্রহ্লাদ মহারাজ অত্যন্ত বিস্ময়ান্বিত হয়েছিলেন। আত্ম-তত্ত্বজ্ঞান উপলব্ধির ফলে অধ্যাত্মবাদীর মুখমণ্ডল স্বভাবতই তেজোদ্দীপ্ত হয়, এবং যাঁরা আধ্যাত্মিক জ্ঞানে উন্নত, তাঁরা অবশ্যই ব্রাহ্মণের শরীর সমন্বিত বলে বিবেচনা করা হয়। যেহেতু সেই জ্যোতির্ময় মুখমণ্ডল সমন্বিত মহাত্মা কোন কর্ম না করে ভূমিতে শায়িত থাকা সত্ত্বেও স্থূলকায় ছিলেন, তাই প্রহ্লাদ মহারাজ বিস্ময়ান্বিত হয়ে তাঁকে সেই বিষয়ে প্রশ্ন করেছিলেন।

শ্লোক ১৯

কবিঃ কল্পো নিপুণদৃক্ চিত্রপ্রিয়কথঃ সমঃ ।
লোকস্য কুর্বতঃ কর্ম শেষে তদ্বীক্ষিতাপি বা ॥ ১৯ ॥

কবিঃ—অত্যন্ত বিদ্বান; **কল্পঃ**—দক্ষ; **নিপুণদৃক্**—বুদ্ধিমান; **চিত্র-প্রিয়-কথঃ**—হৃদয়ের প্রসন্নতা বিধানকারী মধুর বাণী বলতে সক্ষম; **সমঃ**—সমদর্শী; **লোকস্য**—জনসাধারণের; **কুর্বতঃ**—যুক্ত; **কর্ম**—সকাম কর্ম; **শেষে**—আপনি শয়ন করেন; **তৎ-বীক্ষিতা**—তাদের দেখে; **অপি**—যদিও; **বা**—অথবা।

অনুবাদ

আপনি বিদ্বান, দক্ষ, বুদ্ধিমান এবং হৃদয়ের প্রসন্নতা বিধানকারী প্রিয়বাদী। সাধারণ মানুষদের সকাম কর্মে লিপ্ত থাকতে দেখেও আপনি নিরুদ্যম হয়ে শয়ান রয়েছেন।

তাৎপর্য

প্রহ্লাদ মহারাজ সেই মহাত্মার শারীরিক লক্ষণ বিচার করে বুঝতে পেরেছিলেন যে, তিনি নিষ্ক্রিয়ভাবে শায়িত থাকলেও তিনি ছিলেন অত্যন্ত বুদ্ধিমান এবং দক্ষ। প্রহ্লাদ মহারাজ স্বাভাবিকভাবে জানতে উৎসুক ছিলেন কেন তিনি নিরুদ্যম হয়ে সেখানে শয়ান আছেন।

শ্লোক ২০

শ্রীনারদ উবাচ

স ইত্থং দৈত্যপতিনা পরিপৃষ্টো মহামুনিঃ ।
স্ময়মানস্তমভ্যাহ তদ্বাগমৃতযন্ত্রিতঃ ॥ ২০ ॥

শ্রী-নারদঃ উবাচ—শ্রীনারদ মুনি বললেন; **সঃ**—সেই মহাত্মা (যিনি শয়ান ছিলেন); **ইত্থম্**—এইভাবে; **দৈত্য-পতিনা**—দৈত্যরাজ (প্রহ্লাদ মহারাজের) দ্বারা; **পরিপৃষ্টঃ**—যথেষ্টভাবে জিজ্ঞাসিত হয়ে; **মহা-মুনিঃ**—সেই মহাপুরুষ; **স্ময়মানঃ**—স্মিত হেসে; **তম্**—তাঁকে (প্রহ্লাদ মহারাজকে); **অভ্যাহ**—উত্তর দিতে প্রস্তুত হয়েছিলেন; **তৎ-বাক্**—তাঁর বাণী; **অমৃত-যন্ত্রিতঃ**—অমৃতের দ্বারা মুগ্ধ হয়ে।

অনুবাদ

নারদ মুনি বললেন—দৈত্যরাজ প্রহ্লাদ মহারাজের দ্বারা এইভাবে জিজ্ঞাসিত এবং তাঁর বাক্যামৃতে বশীভূত হয়ে, সেই মহাত্মা ঈষৎ হাস্য সহকারে এইভাবে উত্তর দিয়েছিলেন।

শ্লোক ২১

শ্রীব্রাহ্মণ উবাচ

বেদেদমসুরশ্রেষ্ঠ ভবান্ নন্বার্যসম্মতঃ ।
ঈহো পরময়োর্নৃণাং পদান্যধ্যাত্মচক্ষুষা ॥ ২১ ॥

শ্রী-ব্রাহ্মণঃ উবাচ—সেই ব্রাহ্মণ উত্তর দিলেন; **বেদ**—ভালভাবে জেনে রাখুন; **ইদম্**—এই সমস্ত বস্তু; **অসুর-শ্রেষ্ঠ**—হে অসুরশ্রেষ্ঠ; **ভবান্**—আপনি; **ননু**—বস্তুতপক্ষে; **আর্য-সম্মতঃ**—যাঁর কার্যকলাপ সভ্য মানুষদের দ্বারা অনুমোদিত; **ঈহা**—প্রবণতার; **উপরময়োঃ**—হ্রাসের; **নৃণাম্**—সাধারণ মানুষদের; **পদানি**—বিভিন্ন অবস্থা; **অধ্যাত্ম-চক্ষুষা**—দিব্য চক্ষুর দ্বারা।

অনুবাদ

সেই ব্রাহ্মণ মহাত্মা বললেন—হে অসুরশ্রেষ্ঠ প্রহ্লাদ মহারাজ, আপনি সুসভ্য মানুষদের পূজ্য, আপনি জীবনের বিভিন্ন অবস্থা সম্বন্ধে অবগত, কারণ আপনি

দিব্য চক্ষু লাভ করেছেন, যার দ্বারা আপনি মানুষের চরিত্র দর্শন করতে পারেন এবং মানুষের প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি সম্বন্ধে স্পষ্টভাবে অবগত।

তাৎপর্য

ভগবদ্ভক্তির শুদ্ধ দৃষ্টির প্রভাবে প্রহ্লাদ মহারাজের মতো শুদ্ধ ভক্ত অন্যদের চরিত্র অনায়াসে বুঝতে পারেন।

শ্লোক ২২

যস্য নারায়ণো দেবো ভগবান্ হৃদ্‌গতঃ সদা ।
ভক্ত্যা কেবলয়াজ্ঞানং ধুনোতি ধ্বান্তমর্কবৎ ॥ ২২ ॥

যস্য—যাঁর; **নারায়ণঃ দেবঃ**—পরমেশ্বর ভগবান নারায়ণ; **ভগবান্**—ভগবান; **হৃৎ-গতঃ**—হৃদয়ে; **সদা**—সর্বদা; **ভক্ত্যা**—ভক্তির দ্বারা; **কেবলয়া**—কেবল; **অজ্ঞানম্**—অজ্ঞান; **ধুনোতি**—নির্মল করেন; **ধ্বান্তম্**—অন্ধকার; **অর্কবৎ**—সূর্যের মতো।

অনুবাদ

সর্বৈশ্বর্যপূর্ণ ভগবান নারায়ণ আপনার হৃদয়ে বিরাজ করেন, কারণ আপনি তাঁর শুদ্ধ ভক্ত। সূর্য যেমন জগতের অন্ধকার দূর করে, ঠিক তেমনই তিনিও সর্বদা আপনার অজ্ঞান অন্ধকার দূর করছেন।

তাৎপর্য

ভক্ত্যা কেবলয়া শব্দ দুটি ইঙ্গিত করে যে, কেবল ভগবদ্ভক্তির অনুশীলনের ফলে পূর্ণ জ্ঞান লাভ করা যায়। শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত জ্ঞানের ঈশ্বর (*ঐশ্বর্যস্য সমগ্রস্য বীর্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ*)। ভগবান সকলের হৃদয়ে বিরাজমান (*ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি*), এবং ভগবান যখন ভক্তের প্রতি প্রসন্ন হন, তখন তিনি তাঁকে উপদেশ দেন। কিন্তু ভগবান ভক্তকেই কেবল উপদেশ দেন, যার ফলে তিনি ভগবদ্ভক্তির পথে ক্রমশ উন্নতি সাধন করতে পারেন। অন্যদের, অর্থাৎ অভক্তদের ভগবান তাদের শরণাগতির মাত্রা অনুসারে উপদেশ দেন। শুদ্ধ ভক্তের বর্ণনা করে এখানে বলা হয়েছে, *ভক্ত্যা কেবলয়া*। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বিশ্লেষণ করেছেন যে, *ভক্ত্যা কেবলয়া*-এর অর্থ *জ্ঞানকর্মাদ্যমিশ্রয়া*, 'সকাম কর্ম এবং মনোধর্মী জ্ঞানের মিশ্রণ রহিত।' ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে শরণাগতিই ভক্তের সমস্ত জ্ঞান এবং উপলব্ধির কারণ।

শ্লোক ২৩

তথাপি ব্রূমহে প্রশ্নাংস্তব রাজন্ যথাশ্রুতম্ ।
সম্ভাষণীয়ো হি ভবানাত্মনঃ শুদ্ধিমিচ্ছতা ॥ ২৩ ॥

তথাপি—তবুও; **ব্রূমহে**—আমি উত্তর দেব; **প্রশ্নান্**—সমস্ত প্রশ্নের; **তব**—আপনার; **রাজন্**—হে রাজন্; **যথা-শ্রুতম্**—মহাজনদের কাছে আমি যেভাবে শ্রবণ করেছি; **সম্ভাষণীয়ঃ**—সম্ভাষণযোগ্য; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **ভবান্**—আপনার; **আত্মনঃ**—আত্মার; **শুদ্ধিম্**—শুদ্ধি; **ইচ্ছতা**—আকাঙ্ক্ষী।

অনুবাদ

হে রাজন্, যদিও আপনি সব কিছুই জানেন, তবুও আপনি কয়েকটি প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন। মহাজনদের কাছে আমি যেভাবে শ্রবণ করেছি, সেই অনুসারে আমি আপনার প্রশ্নগুলির উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব। এই প্রসঙ্গে আমি নীরব থাকতে পারি না, কারণ আপনার মতো আত্ম-শুদ্ধকামী ব্যক্তি আমার সম্ভাষণের যোগ্য।

তাৎপর্য

সাধু সকলের সঙ্গে কথা বলতে চান না, এবং তাই তিনি গম্ভীর ও মৌন। সাধারণত মানুষ উপদেশ গ্রহণ করতে চায় না। বলা হয় যে, উপদেশ গ্রহণে অনিচ্ছুক ব্যক্তিকে সাধু সম্ভাষণ করেন না; যদিও কখনও কখনও অসীম করুণাবশত সাধু সাধারণ মানুষদের সঙ্গে কথা বলতে পারেন। কিন্তু, প্রহ্লাদ মহারাজ যেহেতু সাধারণ মানুষ ছিলেন না, তাই যে প্রশ্ন তিনি করেছিলেন তা মহাপুরুষেরও উত্তর দানের যোগ্য ছিল। তাই সেই মহাত্মা ব্রাহ্মণ নীরব না থেকে উত্তর দিতে শুরু করেছিলেন। সেই সমস্ত উত্তর কিন্তু তাঁর কল্পনাপ্রসূত ছিল না। তাই সেই সম্পর্কে তিনি বলেছেন *যথাশ্রুতম্*, অর্থাৎ 'যেভাবে আমি মহাজনদের কাছ থেকে তা শ্রবণ করেছি।' পরম্পরার প্রথায় প্রশ্ন যখন প্রামাণিক হয়, তখন তার উত্তরও প্রামাণিক হয়। কখনও মনগড়া উত্তর তৈরি করার চেষ্টা করা উচিত নয়। শাস্ত্রের প্রমাণ প্রদান করে বৈদিক সিদ্ধান্ত অনুসারে উত্তর দেওয়া উচিত। *যথাশ্রুতম্* শব্দটি বৈদিক জ্ঞানকে ইঙ্গিত করে। *বেদকে* বলা হয় *শ্রুতি*, কারণ সেই জ্ঞান মহাজনদের কাছ থেকে লব্ধ। *বেদের* বাণীকে শ্রুতি-প্রমাণ বলা হয়। মানুষের কর্তব্য *শ্রুতি* বা *বেদ* থেকে প্রমাণের উদ্ধৃতি দেওয়া, এবং তা হলে সেই উক্তি সঠিক হবে। তা না হলে তার উক্তি মনের কল্পনাপ্রসূত হবে।

শ্লোক ২৩

তথাপি ব্রূমহে প্রশ্নাংস্তব রাজন্ যথাশ্রুতম্ ।
সম্ভাষণীয়ো হি ভবানাত্মনঃ শুদ্ধিমিচ্ছতা ॥ ২৩ ॥

তথাপি—তবুও; **ব্রূমহে**—আমি উত্তর দেব; **প্রশ্নান্**—সমস্ত প্রশ্নের; **তব**—আপনার; **রাজন্**—হে রাজন্; **যথা-শ্রুতম্**—মহাজনদের কাছে আমি যেভাবে শ্রবণ করেছি; **সম্ভাষণীয়ঃ**—সম্ভাষণযোগ্য; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **ভবান্**—আপনার; **আত্মনঃ**—আত্মার; **শুদ্ধিম্**—শুদ্ধি; **ইচ্ছতা**—আকাঙ্ক্ষী।

অনুবাদ

হে রাজন্, যদিও আপনি সব কিছুই জানেন, তবুও আপনি কয়েকটি প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন। মহাজনদের কাছে আমি যেভাবে শ্রবণ করেছি, সেই অনুসারে আমি আপনার প্রশ্নগুলির উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব। এই প্রসঙ্গে আমি নীরব থাকতে পারি না, কারণ আপনার মতো আত্ম-শুদ্ধকামী ব্যক্তি আমার সম্ভাষণের যোগ্য।

তাৎপর্য

সাধু সকলের সঙ্গে কথা বলতে চান না, এবং তাই তিনি গম্ভীর ও মৌন। সাধারণত মানুষ উপদেশ গ্রহণ করতে চায় না। বলা হয় যে, উপদেশ গ্রহণে অনিচ্ছুক ব্যক্তিকে সাধু সম্ভাষণ করেন না; যদিও কখনও কখনও অসীম করুণাবশত সাধু সাধারণ মানুষদের সঙ্গে কথা বলতে পারেন। কিন্তু, প্রহ্লাদ মহারাজ যেহেতু সাধারণ মানুষ ছিলেন না, তাই যে প্রশ্ন তিনি করেছিলেন তা মহাপুরুষেরও উত্তর দানের যোগ্য ছিল। তাই সেই মহাত্মা ব্রাহ্মণ নীরব না থেকে উত্তর দিতে শুরু করেছিলেন। সেই সমস্ত উত্তর কিন্তু তাঁর কল্পনাপ্রসূত ছিল না। তাই সেই সম্পর্কে তিনি বলেছেন *যথাশ্রুতম্*, অর্থাৎ 'যেভাবে আমি মহাজনদের কাছ থেকে তা শ্রবণ করেছি।' পরম্পরার প্রথায় প্রশ্ন যখন প্রামাণিক হয়, তখন তার উত্তরও প্রামাণিক হয়। কখনও মনগড়া উত্তর তৈরি করার চেষ্টা করা উচিত নয়। শাস্ত্রের প্রমাণ প্রদান করে বৈদিক সিদ্ধান্ত অনুসারে উত্তর দেওয়া উচিত। *যথাশ্রুতম্* শব্দটি বৈদিক জ্ঞানকে ইঙ্গিত করে। *বেদকে* বলা হয় *শ্রুতি*, কারণ সেই জ্ঞান মহাজনদের কাছ থেকে লব্ধ। *বেদের* বাণীকে শ্রুতি-প্রমাণ বলা হয়। মানুষের কর্তব্য *শ্রুতি* বা *বেদ* থেকে প্রমাণের উদ্ধৃতি দেওয়া, এবং তা হলে সেই উক্তি সঠিক হবে। তা না হলে তার উক্তি মনের কল্পনাপ্রসূত হবে।

জড় বাসনা থেকে মুক্তই হোন, অথবা জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্তি লাভের প্রয়াসীই হোন, তাঁর কর্তব্য সর্বতোভাবে পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা করা।" (*শ্রীমদ্ভাগবত* ২/৩/১০)

অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্মাদ্যনাবৃতম্ ।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা ॥

"মানুষের কর্তব্য সকাম কর্ম এবং মনোধর্মী জ্ঞানের মাধ্যমে জাগতিক লাভের বাসনা ত্যাগ করে, অনুকূলভাবে ভগবানের প্রেমময়ী সেবা সম্পাদন করা। তাকে বলা হয় শুদ্ধ ভক্তি।" (*ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* ১/১/১১)

শ্লোক ২৫

যদৃচ্ছয়া লোকমিমং প্রাপিতঃ কর্মভির্ভ্রমন্ ।
স্বর্গাপবর্গয়োর্দ্বারং তিরশ্চাং পুনরস্য চ ॥ ২৫ ॥

যদৃচ্ছয়া—সংসার প্রবাহে প্রবাহিত; **লোকম্**—মনুষ্যরূপ; **ইমম্**—এই; **প্রাপিতঃ**—প্রাপ্ত হয়েছি; **কর্মভিঃ**—বিভিন্ন সকাম কর্মের প্রভাবের দ্বারা; **ভ্রমন্**—এক জীবন থেকে আর এক জীবনে ভ্রমণ করতে করতে; **স্বর্গ**—স্বর্গলোকে; **অপবর্গয়োঃ**—মুক্তির; **দ্বারম্**—দ্বার; **তিরশ্চাম্**—নিম্ন স্তরের যোনি; **পুনঃ**—পুনরায়; **অস্য**—মানুষের; **চ**—এবং।

অনুবাদ

অবাঞ্ছিত জড় ইন্দ্রিয়তৃপ্তির বাসনাজনিত সকাম কর্মের ফলে, বিবর্তনের পন্থায় আমি এই মনুষ্য-শরীর প্রাপ্ত হয়েছি, যা স্বর্গ, মুক্তি, নিম্ন স্তরের যোনি অথবা পুনরায় মনুষ্যজন্ম প্রদান করতে পারে।

তাৎপর্য

এই জড় জগতে সমস্ত জীব প্রকৃতির নিয়ম অনুসারে জন্ম-মৃত্যুর চক্রে আবর্তিত হচ্ছে। বিভিন্ন যোনিতে জন্ম-মৃত্যুর এই সংগ্রামকে বিবর্তনের পন্থা বলা যেতে পারে, কিন্তু পাশ্চাত্য জগতে তার বিশ্লেষণ ভ্রান্তভাবে করা হয়েছে। ডারউইনের বিবর্তনবাদ বলে যে, পশু থেকে মানুষের উৎপত্তি হয়েছে; কিন্তু এই মতবাদ ভ্রান্ত, কারণ তাতে বিপরীত অবস্থার কথা বলা হয়নি, অর্থাৎ মানুষ যে পশুতে পরিণত হতে পারে, সেই বিবর্তনের কথা বলা হয়নি। কিন্তু এই শ্লোকে বৈদিক

প্রমাণের ভিত্তিতে বিবর্তনের পন্থা খুব সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। বিবর্তনের পন্থায় লব্ধ মনুষ্য-জীবন হচ্ছে উন্নতি সাধনের (*স্বর্গাপবর্গ*) অথবা অবনতি সাধনের (*তিরশ্চাম্ পুনরস্য চ*) একটি সুযোগ। কেউ যদি যথাযথভাবে এই মনুষ্য-জীবনের সদ্ব্যবহার করে, তা হলে সে উচ্চতর লোকে উন্নীত হতে পারে, যেখানে জড় সুখ এই পৃথিবীর সুখের থেকে হাজার হাজার গুণ অধিক, অথবা জ্ঞানের অনুশীলনের দ্বারা সে সংসার-চক্র থেকে মুক্ত হয়ে তার স্বাভাবিক চিন্ময় স্বরূপে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হতে পারে। তাকে বলা হয় *অপবর্গ* বা মুক্তি।

জড়জাগতিক জীবনকে বলা হয় প-বর্গ, কারণ এখানে আমাদের পাঁচ প্রকার ক্লেশ ভোগ করতে হয়। এই পাঁচটি ক্লেশ প-বর্গের পাঁচটি অক্ষর—প ফ ব ভ এবং ম-এর দ্বারা সূচিত হয়। প-এর অর্থ পরিশ্রম, ফ-এর অর্থ ফেনা, যেমন আমরা কখনও কখনও দেখতে পাই যে, কঠোর পরিশ্রমের ফলে ঘোড়ার মুখ দিয়ে ফেনা বেরোয়। ব-এর অর্থ ব্যর্থতা। কঠোর পরিশ্রম করা সত্ত্বেও চরমে দেখা যায় যে, সব কিছুই ব্যর্থ। ভ-এর অর্থ ভয়। জড় জগতে সংসার-দাবানলে দগ্ধ জীব সর্বদাই ভীত, কারণ এখানে কেউই জানে না এরপর কি হবে। অবশেষে ম-এর অর্থ মৃত্যু। কেউ যখন জীবনের এই পাঁচটি অবস্থার নিরসন করার চেষ্টা করে, তখন তাকে বলা হয় *অপবর্গ* বা সংসার জীবনের দ্বন্দ্ব থেকে মুক্তি।

তিরশ্চাম্ শব্দটির অর্থ নিকৃষ্ট স্তরের জীবন। মনুষ্য-জীবন নিঃসন্দেহে জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ অবস্থার সুযোগ প্রদান করে। পাশ্চাত্যের মানুষেরা মনে করে যে, মানুষ বানর থেকে এসেছে এবং এখন তারা অধিক সুখে অবস্থিত। কিন্তু কেউ যদি স্বর্গ বা অপবর্গের জন্য মনুষ্য-জীবনের সদ্ব্যবহার না করে, তা হলে সে পুনরায় কুকুর অথবা শূকরের মতো পশুজীবনে অধঃপতিত হবে। তাই বুদ্ধিমান মানুষের বিবেচনা করা উচিত যে, তিনি কি স্বর্গলোকে উন্নীত হবেন, অথবা সংসার-চক্র থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য প্রস্তুত হবেন, না কি বিবর্তনের পন্থায় পুনরায় নিম্ন যোনিতে অধঃপতিত হবেন। কেউ যদি পুণ্যকর্ম করেন, তা হলে তিনি উচ্চতর লোকে উন্নীত হতে পারেন অথবা মুক্ত হয়ে তাঁর প্রকৃত আলয় ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে পারেন। কিন্তু তা না হলে কুকুর, শূকর আদি নিম্ন স্তরের যোনিতে অধঃপতিত হতে পারেন। *ভগবদ্গীতায়* (৯/২৫) বিশ্লেষণ করা হয়েছে—*যান্তি দেবব্রতা দেবান্*। যাঁরা উচ্চতর লোকে (দেবলোক বা স্বর্গলোকে) উন্নীত হওয়ার অভিলাষী তাঁদের সেই জন্য প্রস্তুত হতে হবে। তেমনই, কেউ যদি মুক্ত হয়ে ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে চান, তা হলেও তাঁকে সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে হবে।

তাই আমাদের এই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন মানব-সমাজের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ আশীর্বাদ, কারণ এই আন্দোলন মানুষকে শিক্ষা দিচ্ছে কিভাবে ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে হয়। *ভগবদ্গীতায়* (১৩/২২) স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণের সঙ্গ প্রভাবে বিভিন্ন প্রকার জীবন লাভ হয় (*কারণং গুণসঙ্গোঽস্য সদসদ্যোনিজন্মসু*)। এই জীবনে জড়া প্রকৃতির সত্ত্ব, রজ এবং তমোগুণের সঙ্গ অনুসারে জীব তার পরবর্তী জন্মে উপযুক্ত শরীর প্রাপ্ত হয়। আধুনিক সভ্যতা জানে না যে, জীব নিত্য হওয়া সত্ত্বেও, প্রকৃতির সঙ্গ অনুসারে বিভিন্ন রুগ্ন পরিস্থিতিরূপ বিভিন্ন প্রকার যোনি প্রাপ্ত হয়। আধুনিক সভ্যতা জড়া প্রকৃতির নিয়ম সম্বন্ধে অবগত নয়।

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্মাণি সর্বশঃ ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্তাহমিতি মন্যতে ॥

"মোহাচ্ছন্ন জীব প্রাকৃত অহঙ্কারবশত জড়া প্রকৃতির ত্রিগুণ দ্বারা ক্রিয়মান সমস্ত কার্যকে স্বীয় কার্য বলে মনে করে 'আমি কর্তা'—এই রকম অভিমান করে।" (*ভগবদ্গীতা* ৩/২৭) প্রতিটি জীবই জড়া প্রকৃতির কঠোর নিয়মের নিয়ন্ত্রণাধীন। কিন্তু মূর্খেরা নিজেদের স্বাধীন বলে মনে করে। প্রকৃতপক্ষে, তারা কখনই স্বাধীন হতে পারে না। এটিই হচ্ছে মূর্খতা। মূর্খের সভ্যতা অত্যন্ত বিপজ্জনক, এবং তাই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন মানুষকে বোঝাবার চেষ্টা করছে যে, তারা সর্বতোভাবে প্রকৃতির নিয়মের নিয়ন্ত্রণাধীন। এইভাবে এই আন্দোলন শ্রীকৃষ্ণের বহিরঙ্গা শক্তি মায়ার প্রবল প্রভাব থেকে তাদের রক্ষা করার চেষ্টা করছে। জড়া প্রকৃতির নিয়মের পিছনে রয়েছেন পরম নিয়ন্তা শ্রীকৃষ্ণ (*ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্*)। তাই কেউ যদি শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হন (*মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে*), তা হলে তিনি তৎক্ষণাৎ বহিরঙ্গা প্রকৃতির নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত হতে পারেন (*স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে*)। সেটিই জীবনের লক্ষ্য হওয়া উচিত।

শ্লোক ২৬

তত্রাপি দম্পতীনাং চ সুখায়ান্যাপনুত্তয়ে ।
কর্মাণি কুর্বতাং দৃষ্ট্বা নিবৃত্তোঽস্মি বিপর্যয়ম্ ॥ ২৬ ॥

তত্র—সেখানে; **অপি**—ও; **দম্পতীনাম্**—বিবাহের মাধ্যমে যুক্ত পুরুষ এবং স্ত্রীর; **চ**—এবং; **সুখায়**—সুখের জন্য, বিশেষ করে মৈথুনসুখ; **অন্য-অপনুত্তয়ে**—দুঃখ

নিবৃত্তির জন্য; **কর্মাণি**—সকাম কর্ম; **কুর্বতাম্**—সর্বদা লিপ্ত; **দৃষ্ট্বা**—দর্শন করে; **নিবৃত্তঃ অস্মি**—আমি নিবৃত্ত হয়েছি (সেই প্রকার কর্ম থেকে); **বিপর্যয়ম্**—বিপরীত।

অনুবাদ

মনুষ্য-জীবনে স্ত্রী এবং পুরুষ মৈথুনসুখ উপভোগের জন্য যুক্ত হয়, কিন্তু বাস্তবিক অভিজ্ঞতার দ্বারা আমরা দেখতে পাই যে, তারা কেউই সুখী নয়। তাই, বিপরীত ফল দর্শন করে আমি জড়-জাগতিক কর্ম থেকে নিবৃত্ত হয়েছি।

তাৎপর্য

প্রহ্লাদ মহারাজ বলেছেন, *যন্মৈথুনাদিগৃহমেধিসুখং হি তুচ্ছম্*। পুরুষ এবং স্ত্রী উভয়েই যৌন সুখ উপভোগের অন্বেষণ করে, এবং তারা যখন বিবাহ অনুষ্ঠানের দ্বারা যুক্ত হয়, তখন কিছু কালের জন্য তারা সুখী হয়, কিন্তু অবশেষে তাদের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয় এবং অনেক সময় বিবাহ-বিচ্ছেদ হয়। যদিও প্রতিটি স্ত্রী এবং পুরুষ মৈথুনের মাধ্যমে সুখ উপভোগ করতে চায়, কিন্তু পরিণামে কলহ এবং ক্লেশই কেবল প্রাপ্তি হয়। বিবাহের প্রথা পুরুষ এবং স্ত্রীকে নিয়ন্ত্রিত যৌনজীবনের অনুমতি প্রদান করে, যা *ভগবদ্গীতাতেও* ভগবানের দ্বারা অনুমোদিত হয়েছে। *ধর্মাবিরুদ্ধো ভূতেষু কামোঽস্মি*—যে যৌন জীবন ধর্মবিরুদ্ধ নয়, তা শ্রীকৃষ্ণ। প্রতিটি জীব সর্বদা মৈথুনসুখের জন্য উৎসুক, কারণ আহার, নিদ্রা, ভয় এবং মৈথুন নিয়েই জড়-জাগতিক জীবন। পশুজীবনে আহার, নিদ্রা, ভয় এবং মৈথুন নিয়ন্ত্রণ করা যায় না, কিন্তু মানব-সমাজে যে সমস্ত মানুষ পশুর মতো তাদের আহার, নিদ্রা, এবং মৈথুনের প্রবৃত্তি চরিতার্থ করে এবং ভয় থেকে আত্মরক্ষার সুযোগ গ্রহণ করে, তাদের পরিকল্পনার মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করা কর্তব্য। আহারের জন্য বৈদিক পরিকল্পনায় শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদিত খাদ্য অর্থাৎ প্রসাদ বা *যজ্ঞশিষ্ট* গ্রহণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। *যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্বকিল্বিষৈঃ*—"ভগবদ্ভক্ত সব রকম পাপ থেকে মুক্ত, কারণ তিনি যজ্ঞাবশিষ্ট ভোজন করেন।" (*ভগবদ্গীতা* ৩/১৩) জড়-জাগতিক জীবনে মানুষ নানা রকম পাপকর্ম করে, বিশেষ করে খাওয়ার ব্যাপারে, এবং এই পাপকর্মের ফলে মানুষকে প্রকৃতির নিয়মানুসারে দণ্ডস্বরূপ অন্য শরীর গ্রহণ করতে হয়। মৈথুন এবং আহার আবশ্যক, এবং তাই সেগুলি বৈদিক বিধি-নিষেধের অধীনে মানব-সমাজে প্রদান করা হয়েছে, যাতে মানুষ বৈদিক নির্দেশ অনুসারে আহার, নিদ্রা, মৈথুনসুখ ও ভয়ভীতির জীবন থেকে নিরাপত্তা লাভ করতে পারে এবং ক্রমশ জড় জগতের দণ্ডভোগ থেকে

মুক্ত হয়ে উন্নত জীবন লাভ করতে পারে। এইভাবে মানব-সমাজে বিবাহের বৈদিক প্রথা রয়েছে, যাতে বিবাহ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পুরুষ এবং স্ত্রী মিলিতভাবে আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনের জন্য পরস্পরকে সাহায্য করতে পারে। দুর্ভাগ্যবশত, বিশেষ করে এই যুগে, পুরুষ এবং স্ত্রীলোকেরা অনিয়ন্ত্রিতভাবে মৈথুনসুখে লিপ্ত হচ্ছে। তাদের এই অন্যায় আচরণের ফলে, তাদের এই পশু প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার জন্য পুনরায় তাদের পশুরূপে জন্মগ্রহণ করতে হবে। তাই বৈদিক নির্দেশে সাবধান করে দেওয়া হয়েছে, *নায়ং দেহো দেহভাজাং নৃলোকে কষ্টান্ কামানর্হতে বিড্‌ভুজাং যে*—শূকরের মতো মৈথুনসুখ ভোগে লিপ্ত হওয়া এবং সব কিছু খাওয়া, এমন কি বিষ্ঠা পর্যন্ত খাওয়া মানুষের পক্ষে উচিত নয়। মানুষের কর্তব্য ভগবানকে নিবেদিত প্রসাদ গ্রহণ করা এবং বৈদিক নির্দেশ অনুসারে যৌন জীবনে লিপ্ত হওয়া। তার কর্তব্য কৃষ্ণভাবনায় যুক্ত হয়ে ভয়ঙ্কর জড়-জাগতিক পরিস্থিতি থেকে মুক্ত হওয়া, এবং কেবল কঠোর পরিশ্রমজনিত ক্লান্তি দূর করার জন্য নিদ্রা যাওয়া।

বিদ্বান ব্রাহ্মণ বলেছিলেন যে, যেহেতু সকাম কর্মীদের দ্বারা সব কিছুরই অপব্যবহার হচ্ছে, তাই তিনি সব রকম সকাম-কর্ম থেকে নিবৃত্ত হয়েছেন।

শ্লোক ২৭

সুখমস্যাত্মনো রূপং সর্বেহোপরতিস্তনুঃ ।
মনঃসংস্পর্শজান্ দৃষ্ট্বা ভোগান্ স্বপ্স্যামি সংবিশন্ ॥ ২৭ ॥

সুখম্—সুখ; **অস্য**—তার; **আত্মনঃ**—জীবের; **রূপম্**—স্বাভাবিক স্থিতি; **সর্ব**—সমস্ত; **ঈহ**—জড় কার্যকলাপ; **উপরতিঃ**—সর্বতোভাবে নিবৃত্তি; **তনুঃ**—প্রকাশের মাধ্যম; **মনঃ-সংস্পর্শজান্**—ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের চাহিদা থেকে উৎপন্ন; **দৃষ্ট্বা**—দর্শন করে; **ভোগান্**—ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ; **স্বপ্স্যামি**—এই সমস্ত জড় কার্যকলাপের বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা করে, আমি নীরবে বসে রয়েছি; **সংবিশন্**—এই প্রকার কার্যকলাপে প্রবেশ করে।

অনুবাদ

জীব তার প্রকৃত স্বরূপে আনন্দময়। এই আনন্দ তখনই লাভ হয়, যখন সে সমস্ত জড়-জাগতিক কার্যকলাপ থেকে নিবৃত্ত হয়। জড় সুখভোগ কল্পনা মাত্র। তাই সেই বিষয়ে বিবেচনা করে আমি সমস্ত জড়-জাগতিক কার্যকলাপ থেকে নিবৃত্ত হয়েছি এবং এখানে শায়িত রয়েছি।

তাৎপর্য

মায়াবাদ দর্শন এবং বৈষ্ণব দর্শনের পার্থক্য এখানে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। মায়াবাদী এবং বৈষ্ণব উভয়েই জানেন যে, জড়-জাগতিক কার্যকলাপে কোন সুখ নেই। মায়াবাদীরা তাই *ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা* বলে মিথ্যা জড়-জাগতিক কার্যকলাপ থেকে বিরত হয়। তারা সমস্ত কার্যকলাপের নিবৃত্তি সাধন করে ব্রহ্মে লীন হয়ে যেতে চায়। কিন্তু বৈষ্ণব-দর্শন অনুসারে, জড়-জাগতিক কার্যকলাপ থেকে নিরস্ত হলেও বেশিক্ষণ নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকা যায় না, এবং তাই সকলেরই আধ্যাত্মিক কার্যকলাপে যুক্ত হওয়া উচিত, যা এই জড় জগতের দুঃখ-দুর্দশারূপ সমস্ত সমস্যার সমাধান করবে। তাই বলা হয়, মায়াবাদীরা যদিও জড়-জাগতিক কার্যকলাপ থেকে বিরত হয়ে ব্রহ্মে লীন হতে চায়, এবং তারা যদি সত্যি-সত্যিই ব্রহ্মে লীন হয়ে যায়ও, তবুও সক্রিয় না হওয়ার ফলে তারা পুনরায় জড়-জাগতিক কার্যকলাপে অধঃপতিত হয় (*আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ পতন্ত্যধঃ*)। এইভাবে তথাকথিত ত্যাগী সন্ন্যাসী ব্রহ্মের ধ্যানে মগ্ন হতে না পারার ফলে জড়-জাগতিক কার্যকলাপে ফিরে এসে হাসপাতাল, স্কুল ইত্যাদি খোলে। তাই, জড়-জাগতিক কার্যকলাপের ফলে সুখ প্রাপ্তি হয় না—কেবল এই জ্ঞানের অনুশীলন করে সেই প্রকার কার্যকলাপ থেকে নিবৃত্ত হওয়াই যথেষ্ট নয়। জড়-জাগতিক কার্যকলাপ থেকে নিবৃত্ত হয়ে আধ্যাত্মিক কার্যকলাপ গ্রহণ করতে হয়। তখন সেই সমস্যার সমাধান লাভ হয়। আধ্যাত্মিক কার্যকলাপ হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশ অনুসারে কর্ম করা (*আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনম্*)। কেউ যদি শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশ অনুসারে কার্য করেন, তা হলে তাঁর সেই কার্যকলাপ জড়-জাগতিক কার্যকলাপ নয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে, অর্জুন যখন শ্রীকৃষ্ণের আদেশ অনুসারে যুদ্ধ করেছিলেন, তখন তাঁর সেই কার্য জড়-জাগতিক ছিল না। ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের জন্য যুদ্ধ করা জাগতিক কর্ম, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের আদেশ অনুসারে যুদ্ধ করা চিন্ময় কর্ম। চিন্ময় কর্মের প্রভাবে ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার যোগ্য হওয়া যায় এবং তখন নিত্য আনন্দ লাভ করা যায়। এই জড় জগতে সব কিছুই মনের কল্পনা, যা কখনই আমাদের প্রকৃত সুখ প্রদান করতে পারবে না। তাই যথার্থ সমাধান হচ্ছে, সমস্ত জড়-জাগতিক কার্যকলাপ থেকে নিবৃত্ত হয়ে আধ্যাত্মিক কার্যকলাপে যুক্ত হওয়া। *যজ্ঞার্থাৎ কর্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্মবন্ধনঃ*। কেউ যদি পরমেশ্বর ভগবান—যজ্ঞ বা বিষ্ণুর প্রসন্নতা বিধানের জন্য কর্ম করেন, তিনি জীবন্মুক্ত। কিন্তু কেউ যদি তা করতে না পারে, তা হলে তাকে বদ্ধ জীবনে থাকতে হয়।

শ্লোক ২৮

ইত্যেতদাত্মনঃ স্বার্থং সন্তং বিস্মৃত্য বৈ পুমান্ ।
বিচিত্রামসতি দ্বৈতে ঘোরামাপ্নোতি সংসৃতিম্ ॥ ২৮ ॥

ইতি—এইভাবে; **এতৎ**—জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ ব্যক্তি; **আত্মনঃ**—নিজের; **স্ব-অর্থম্**—স্বার্থ; **সন্তম্**—নিজের ভিতর অবস্থান করে; **বিস্মৃত্য**—বিস্মৃত হয়ে; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **পুমান্**—জীব; **বিচিত্রাম্**—আকর্ষণীয় মিথ্যা বৈচিত্র্য; **অসতি**—জড় জগতে; **দ্বৈতে**—অনাত্মে; **ঘোরাম্**—অত্যন্ত ভয়ঙ্কর (জন্ম এবং মৃত্যু স্বীকার করার ফলে); **আপ্নোতি**—বদ্ধ হয়; **সংসৃতিম্**—সংসারে।

অনুবাদ

এইভাবে দেহের বন্ধনে আবদ্ধ জীবাত্মা তার স্বার্থ বিস্মৃত হয় কারণ সে তার দেহকে তার স্বরূপ বলে মনে করে। যেহেতু তার এই দেহ জড় তাই তার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হচ্ছে জড় জগতের বৈচিত্র্যের দ্বারা আকৃষ্ট হওয়া। তার ফলে জীব সংসার-দুঃখ ভোগ করে।

তাৎপর্য

সকলেই সুখী হতে চায়, কারণ পূর্ববর্তী শ্লোকে বলা হয়েছে, *সুখমস্যাত্মনো রূপং সর্বেহোপরতিস্তনুঃ*—জীব যখন তার চিন্ময় স্বরূপে থাকে, তখন সে স্বভাবতই আনন্দময়। চিন্ময় জীবের দুঃখের কোন প্রশ্নই ওঠে না। শ্রীকৃষ্ণ যেমন সর্বদাই আনন্দময়, তাঁর বিভিন্ন অংশ জীবেরাও তেমনই স্বভাবতই আনন্দময়, কিন্তু এই জড় জগতে আসার ফলে এবং শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তাদের নিত্য সম্পর্কের কথা ভুলে যাওয়ার ফলে, তারা তাদের প্রকৃত স্বভাব ভুলে গেছে। যেহেতু আমরা সকলেই শ্রীকৃষ্ণের অংশ, তাই তাঁর সঙ্গে আমাদের এক অতি নিবিড় প্রেমের সম্পর্ক রয়েছে। কিন্তু যেহেতু আমরা আমাদের স্বরূপ বিস্মৃত হয়েছি এবং আমাদের দেহকে আমাদের আত্মা বলে মনে করছি, তাই আমরা জন্ম, মৃত্যু, জরা এবং ব্যাধির ক্লেশের দ্বারা জর্জরিত হচ্ছি। যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের কথা উপলব্ধি করতে না পারি, ততক্ষণ পর্যন্ত সংসার-জীবনের এই ভ্রান্ত ধারণা বর্তমান থাকে। বদ্ধ জীব যে সুখের অন্বেষণ করে, তা অবশ্যই মায়িক, সেই কথা পরবর্তী শ্লোকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

শ্লোক ২৯

জলং তদুদ্ভবৈশ্ছন্নং হিত্বাজ্ঞো জলকাম্যয়া ।
মৃগতৃষ্ণামুপাধাবেৎ তথান্যত্রার্থদৃক্ স্বতঃ ॥ ২৯ ॥

জলম্—জল; **তৎ-উদ্ভবৈঃ**—সেই জল থেকে উৎপন্ন ঘাসের দ্বারা; **ছন্নম্**—আচ্ছাদিত; **হিত্বা**—ত্যাগ করে; **অজ্ঞঃ**—মূর্খ পশু; **জল-কাময়া**—জল পানের বাসনায়; **মৃগতৃষ্ণাম্**—মরীচিকা; **উপাধাবেৎ**—ধাবিত হয়; **তথা**—তেমনই; **অন্যত্র**—অন্য কোনখানে; **অর্থ-দৃক্**—স্বার্থপরায়ণ; **স্বতঃ**—নিজের মধ্যে।

অনুবাদ

হরিণ যেমন অজ্ঞানবশত তৃণাচ্ছন্ন জলাশয় দর্শন না করে মরীচিকার পিছনে ধাবিত হয়, জড় দেহের দ্বারা আচ্ছাদিত জীবও তেমনই তার নিজের মধ্যে যে আনন্দ রয়েছে তা দর্শন না করে, জড় সুখের প্রতি ধাবিত হয়।

তাৎপর্য

জীব যে জ্ঞানের অভাবে কিভাবে তার আত্মার বাইরে সুখের অন্বেষণে ধাবিত হয়, এটি তার একটি সঠিক দৃষ্টান্ত। কেউ যখন চিন্ময় আত্মারূপে তাঁর স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারেন, তখন তিনি পরম চিন্ময় পুরুষ শ্রীকৃষ্ণকে জানতে পারেন, এবং তাঁদের মধ্যে তখন প্রকৃত আনন্দের আদান-প্রদান হয়। এইখানে লক্ষ্যণীয় যে, কিভাবে চিন্ময় আত্মা থেকে দেহের বিকাশ সাধন হয়, তার ইঙ্গিত এই শ্লোকে করা হয়েছে। আধুনিক যুগের জড় বৈজ্ঞানিকেরা মনে করে যে, জড় পদার্থ থেকে জীবনের উদ্ভব হয়েছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে জীবন থেকে জড় পদার্থের উৎপত্তি হয়েছে। জীবন বা জীবাত্মাকে এখানে জলের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে, যা থেকে ঘাসরূপী জড় পদার্থের বিকাশ হয়। যার আত্ম-তত্ত্বজ্ঞান নেই, সে দেহের ভিতরে আত্মায় সুখের অন্বেষণ করে না; পক্ষান্তরে, সে বাইরে সুখের অন্বেষণ করে, ঠিক যেমন একটি হরিণ ঘাসের নিচে জল রয়েছে তা না জেনে, মরুভূমিতে মরীচিকার পিছনে ধাবিত হয়ে জলের অন্বেষণ করে। কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন অনাত্ম বিষয়ে আনন্দের অন্বেষণে বিভ্রান্ত মানুষদের অজ্ঞান দূর করার চেষ্টা করছে। *রসো বৈ সঃ, রসোঽহমপ্সু কৌন্তেয়।* জলের স্বাদ হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণ। তৃষ্ণা নিবৃত্তির জন্য শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গ লাভের দ্বারা আমাদের অবশ্যই সেই স্বাদ পেতে হবে। সেটিই বৈদিক নির্দেশ।

শ্লোক ৩০

দেহাদিভির্দৈবতন্ত্রৈরাত্মনঃ সুখমীহতঃ ।
দুঃখাত্যয়ং চানীশস্য ক্রিয়া মোঘাঃ কৃতাঃ কৃতাঃ ॥ ৩০ ॥

দেহ-আদিভিঃ—দেহ, মন, অহঙ্কার এবং বুদ্ধির দ্বারা; **দৈব-তন্ত্রৈঃ**—পরা শক্তির নিয়ন্ত্রণাধীন; **আত্মনঃ**—আত্মার; **সুখম্**—সুখ; **ঈহতঃ**—অন্বেষণ করে; **দুঃখ-অত্যয়ম্**—দুঃখ নিবারণের জন্য; **চ**—ও; **অনীশস্য**—সর্বতোভাবে জড়া প্রকৃতির নিয়ন্ত্রণাধীন জীবের; **ক্রিয়াঃ**—পরিকল্পনা এবং কার্যকলাপ; **মোঘাঃ কৃতাঃ কৃতাঃ**—বার বার ব্যর্থ হয়।

অনুবাদ

জীব সুখভোগের এবং দুঃখের নিবৃত্তি সাধনের চেষ্টা করে, কিন্তু যেহেতু বিভিন্ন জীবদেহ সম্পূর্ণরূপে জড়া প্রকৃতির নিয়ন্ত্রণাধীন, তাই বিভিন্ন শরীরে তার সমস্ত পরিকল্পনা চরমে ব্যর্থ হয়।

তাৎপর্য

বিষয়াসক্ত ব্যক্তির সকাম কর্মের ফল অনুসারে জড়া প্রকৃতির নিয়ম কিভাবে তার উপর ক্রিয়া করে, সেই বিষয়ে যেহেতু সে সম্পূর্ণ অজ্ঞ, তাই সে তথাকথিত অর্থনৈতিক উন্নতি, পুণ্যকর্মের ফলে স্বর্গলোকে উন্নতি আদি বহু উপায়ে ভ্রান্তভাবে দেহসুখ ভোগ করার পরিকল্পনা করে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, সে তার সকাম কর্মের প্রতিক্রিয়ার শিকার হয়। *ভগবদ্গীতায়* (১৫/১৫) সেই সম্বন্ধে ভগবান বলেছেন—

সর্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো
মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনং চ ।

"আমি সকলের হৃদয়ে অবস্থান করি, এবং আমার থেকেই স্মৃতি, জ্ঞান এবং বিস্মৃতি আসে।" জীবের বাসনা এবং কার্যকলাপ পরমাত্মা উপদ্রষ্টারূপে দর্শন করেন, এবং তিনি প্রকৃতিকে জীবের বিভিন্ন বাসনা পূর্ণ করার আদেশ দেন। সেই সম্বন্ধে *ভগবদ্গীতায়* (১৮/৬১) স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে—

ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি ।
ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া ॥

ভগবান প্রতিটি জীবের হৃদয়ে বিরাজমান, এবং জীবের বাসনা অনুসারে ভগবান তাদের বিভিন্ন প্রকার শরীর প্রদান করেন, যা ঠিক যন্ত্রের মতো। সেই যন্ত্রে

আরোহণ করে, এবং প্রকৃতির গুণের নিয়ন্ত্রণাধীন হয়ে জীব ব্রহ্মাণ্ডে ভ্রমণ করে। তাই জীব স্বাধীন নয়, সম্পূর্ণরূপে জড়া প্রকৃতির নিয়ন্ত্রণাধীন, এবং জড়া প্রকৃতি ভগবানের নিয়ন্ত্রণাধীন।

জীব যখনই জড়া প্রকৃতির উপর আধিপত্য করার বাসনার শিকার হয়, তখনই সে মায়ার অধীন হয়, এবং পরমাত্মা তার কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করেন। তার ফলে জীব বার বার পরিকল্পনা করে এবং তার সেই সমস্ত পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়, কিন্তু মূর্খতাবশত সে তার সেই ব্যর্থতার কারণ দর্শন করতে পারে না। সেই কারণ স্পষ্টভাবে *ভগবদ্গীতায়* উল্লেখ করা হয়েছে—যেহেতু সে ভগবানের শরণাগত হয়নি, তাই তাকে জড়া প্রকৃতি এবং তার কঠোর আইনের অধীনে কর্ম করতে হয় (*দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া*)। সেই বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার একমাত্র উপায় ভগবানের শরণাগত হওয়া। মনুষ্য-জীবনে জীবকে পরম পুরুষ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ গ্রহণ করা অবশ্য কর্তব্য—*সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ* । "সুখভোগের এবং দুঃখ নিবৃত্তির কোন পরিকল্পনা করো না। তুমি কখনই সফল হতে পারবে না। কেবল আমার শরণাগত হও।" কিন্তু, দুর্ভাগ্যবশত, জীব *ভগবদ্গীতায়* ভগবানের দেওয়া এই স্পষ্ট উপদেশটি গ্রহণ করতে পারে না, এবং তার ফলে সে নিরন্তর জড়া প্রকৃতির নিয়মের বন্ধনে আবদ্ধ থাকে।

যজ্ঞার্থাৎ কর্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্মবন্ধনঃ—জীব যদি বিষ্ণু বা যজ্ঞ নামে পরিচিত শ্রীকৃষ্ণের সুখের জন্য কর্ম না করে, তা হলে তাকে অবশ্যই সকাম কর্মের বন্ধনে আবদ্ধ হতে হয়। কর্মের এই প্রতিক্রিয়াকে বলা হয় পাপ এবং পুণ্য। পুণ্যকর্মের ফলে স্বর্গলোকে উন্নতি হয় এবং পাপকর্মের ফলে জড়া প্রকৃতির নিয়মে দণ্ডভোগ করার জন্য নিম্নতর যোনিতে অধঃপতন হয়। নিম্নতর যোনিতে বিবর্তনের পন্থা রয়েছে, এবং যখন নিম্নতর যোনিতে জীবের বন্ধন বা দণ্ডের মেয়াদ শেষ হয়, তখন সে পুনরায় মনুষ্য-জীবন লাভ করে এবং কিভাবে সে পরিকল্পনা করবে তা স্থির করার সুযোগ পায়। সে যদি আবার সেই সুযোগটি হারায়, তা হলে আবার পুনরায় জন্ম-মৃত্যুর চক্রে পতিত হয়ে কখনও ঊর্ধ্বে এবং কখনও নিম্নে সে গমন করে। এই চক্রকে বলা হয় সংসারচক্র। চাকা যেমন কখনও উপরে যায় এবং কখনও নিচে নামে, জড়া প্রকৃতির নিয়মে জীব তেমনই কখনও সুখী এবং কখনও দুঃখী হয়। কিভাবে সে সুখ-দুঃখের চক্রে ক্লেশ ভোগ করে, তা পরবর্তী শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে।

শ্লোক ৩১

আধ্যাত্মিকাদিভির্দুঃখৈরবিমুক্তস্য কর্হিচিৎ ।
মর্ত্যস্য কৃচ্ছ্রোপনতৈরর্থৈঃ কামৈঃ ক্রিয়েত কিম্ ॥ ৩১ ॥

আধ্যাত্মিক-আদিভিঃ—আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক এবং আধিভৌতিক; **দুঃখৈঃ**—ত্রিতাপ দুঃখের দ্বারা; **অবিমুক্তস্য**—যে ব্যক্তি এই দুঃখময় পরিস্থিতি থেকে মুক্ত নয় (অথবা যে জন্ম, মৃত্যু, জরা এবং ব্যাধির অধীন); **কর্হিচিৎ**—কখনও কখনও; **মর্ত্যস্য**—মরণশীল জীবের; **কৃচ্ছ্র-উপনতৈঃ**—কঠোর দুঃখ-দুর্দশার দ্বারা লব্ধ; **অর্থৈঃ**—কোন লাভ হলেও; **কামৈঃ**—যা মানুষের জড় বাসনা চরিতার্থ করতে পারে; **ক্রিয়েত**—তারা কি করে; **কিম্**—এবং এই সুখে কি লাভ।

অনুবাদ

জড়-জাগতিক কার্যকলাপ সর্বদাই আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক এবং আধিভৌতিক, এই ত্রিতাপ দুঃখ মিশ্রিত। তাই, এই প্রকার কার্য সফল হলেও, তাতে কি লাভ? তা সত্ত্বেও তাকে জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি এবং তার সকাম কর্মের ফল ভোগ করতে হয়।

তাৎপর্য

জড়-জাগতিক জীবনে কোন দরিদ্র ব্যক্তি যদি অত্যন্ত কঠোর পরিশ্রম করে তার জীবনের শেষে কিছু লাভ প্রাপ্ত হয়, তা হলে তাকে সফল বলে মনে করা হয়। যদিও তাকে আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক এবং আধিভৌতিক, এই ত্রিতাপ ক্লেশ ভোগ করতে করতে পুনরায় মৃত্যু বরণ করতে হয়। কেউই জড়-জাগতিক জীবনের ত্রিতাপ দুঃখ থেকে মুক্তি লাভ করতে পারে না—যথা, দেহ এবং মন জাত ক্লেশ, সমাজ, জাতি এবং অন্যান্য জীব কর্তৃক প্রদত্ত ক্লেশ, এবং ভূমিকম্প, দুর্ভিক্ষ, বন্যা, মহামারী ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগজনিত ক্লেশ। কেউ যদি কঠোর পরিশ্রম করে, ত্রিতাপ দুঃখ ভোগ করে, এবং তারপর অল্প কিছু সাফল্য লাভ করে, তা হলে সেই সাফল্যের কি মূল্য? আর তা ছাড়া, কর্মী যদি কিছু জড় ঐশ্বর্য সংগ্রহ করতে সফলও হয়, তা হলেও সে তা উপভোগ করতে পারে না, কারণ অবশেষে তাকে শোক করতে করতে মৃত্যুবরণ করতে হয়। আমি নিজে এক মরণাপন্ন ব্যক্তিকে ডাক্তারের কাছে তার আয়ু চার বছর বাড়ানোর জন্য আকুলভাবে আবেদন করতে দেখেছি, যাতে সে তার জড় পরিকল্পনাগুলি পূর্ণ করতে পারে। নিঃসন্দেহে

সেই ডাক্তার তার আয়ু বাড়াতে পারেনি, এবং তাকে গভীরভাবে শোক করতে করতে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছিল। এইভাবে সকলকেই মৃত্যুবরণ করতে হয়, এবং তার মানসিক অবস্থা অনুসারে জড়া প্রকৃতি তাকে অন্য আর একটি শরীরে তার বাসনা চরিতার্থ করার আর একটি সুযোগ দেয়। জড় সুখের পরিকল্পনাগুলির কোন মূল্য নেই, কিন্তু মায়ার প্রভাবে আমরা সেগুলিকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করি। বহু রাজনীতিবিদ্, সমাজ-সংস্কারক এবং দার্শনিক অত্যন্ত কষ্টভোগ করে মৃত্যুবরণ করেছে এবং তাদের জড়-জাগতিক পরিকল্পনাগুলি থেকে কোন লাভ হয়নি। তাই বিজ্ঞ এবং বিচক্ষণ ব্যক্তি কখনও কেবল নৈরাশ্যের মধ্যে মৃত্যুবরণ করার জন্য ত্রিতাপ দুঃখময় কঠোর পরিশ্রম করার বাসনা করেন না।

শ্লোক ৩২

পশ্যামি ধনিনাং ক্লেশং লুব্ধানামজিতাত্মনাম্ ।
ভয়াদলব্ধনিদ্রাণাং সর্বতোঽভিবিশঙ্কিনাম্ ॥ ৩২ ॥

পশ্যামি—আমি দেখতে পাই; **ধনিনাম্**—অত্যন্ত ধনী ব্যক্তিদের; **ক্লেশম্**—কষ্ট; **লুব্ধানাম্**—অত্যন্ত লোভী ব্যক্তিদের; **অজিত-আত্মনাম্**—অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিদের; **ভয়াৎ**—ভয়ের ফলে; **অলব্ধ-নিদ্রাণাম্**—যারা ঘুমাতে পারে না; **সর্বতঃ**—সব দিক থেকে; **অভিবিশঙ্কিনাম্**—অত্যন্ত ভীত হয়ে।

অনুবাদ

ব্রাহ্মণ বললেন—আমি দেখেছি ধন সংগ্রহে অত্যন্ত লোভী অজিতেন্দ্রিয় ধনী ব্যক্তিরা তাদের ধন-সম্পদ থাকা সত্ত্বেও, সর্বদিক থেকে ভীত হওয়ার ফলে ঘুমাতে পর্যন্ত পারে না।

তাৎপর্য

লোভী পুঁজিপতিরা বহু কষ্ট সহ্য করে ধন সঞ্চয় করে, কিন্তু যেহেতু তারা নানা রকম অবৈধ উপায়ে সেই ধন সংগ্রহ করে, তাই তাদের মন সর্বদা বিক্ষুব্ধ থাকে। অতএব তারা রাত্রে ঘুমাতে পারে না, এবং সেই জন্য তাদের ঘুমের ওষুধ খেয়ে ঘুমাতে হয়, এবং অনেক সময় সেই ঘুমের ওষুধগুলিও আর কাজ করে না। তাই এত কঠোর পরিশ্রম করে ধন সংগ্রহ করেও তারা সুখের পরিবর্তে কেবল দুঃখই

ভোগ করে। মন যদি এইভাবে সর্বদা অশান্ত থাকে, তা হলে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের আয়োজন করে কি লাভ? নরোত্তম দাস ঠাকুর তাই গেয়েছেন—

সংসার-বিষানলে, দিবানিশি হিয়া জ্বলে,
জুড়াইতে না কৈনু উপায়।

লোভী পুঁজিপতিদের অনর্থক ধন সংগ্রহের পরিণাম এই হয় যে, তাদের উৎকণ্ঠার আগুনে দগ্ধ হতে হয় এবং সর্বদা আরও লাভের জন্য তার ধন বিনিয়োগ করার চিন্তায় সর্বদা বিচলিত থাকতে হয়। এই প্রকার জীবন অবশ্যই সুখের নয়। কিন্তু মায়ার প্রভাবে বিষয়াসক্ত ব্যক্তিরা এই প্রকার কার্যকলাপে যুক্ত হয়।

আমাদের কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনে আমরা ভগবানের কৃপায় আমাদের গ্রন্থাবলী বিক্রি করে, স্বাভাবিকভাবেই টাকা উপার্জন করছি। এই গ্রন্থগুলি আমাদের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের জন্য বিক্রি করছি না; কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের প্রসারের জন্য আমাদের অনেক কিছু প্রয়োজন, এবং সেই জন্য আমাদের যে অর্থের প্রয়োজন তা শ্রীকৃষ্ণ সরবরাহ করছেন। শ্রীকৃষ্ণ চান যে, সারা পৃথিবী জুড়ে কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের প্রচার হোক, এবং সেই জন্য স্বভাবতই আমাদের যথেষ্ট অর্থের প্রয়োজন। তাই শ্রীল রূপ গোস্বামীর উপদেশ অনুসারে, যে অর্থের দ্বারা কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের প্রসার হতে পারে, সেই অর্থ আমরা বিষয় বলে ত্যাগ করি না। শ্রীল রূপ গোস্বামী *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* গ্রন্থে (১/২/২৫৬) বলেছেন—

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে ॥

"মুক্তিকামী ব্যক্তিরা যে ভগবানের সঙ্গে সম্পর্কিত বস্তুকে প্রাপঞ্চিক বলে মনে করে পরিত্যাগ করে, তাকে বলা হয় ফল্গু বৈরাগ্য বা অসম্পূর্ণ বৈরাগ্য।" যে ধন কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের প্রচারে সহায়ক তা এই জড় জগতের বস্তু নয়, এবং তা জড় বিষয় বলে মনে করা উচিত নয়। শ্রীল রূপ গোস্বামী উপদেশ দিয়েছেন—

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ ।
নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে ॥

"কেউ যখন অনাসক্ত হয়ে সব কিছু শ্রীকৃষ্ণের সম্পর্কে গ্রহণ করেন, তাকে বলা হয় যুক্ত বৈরাগ্য।" (*ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* ১/২/২৫৫) নিঃসন্দেহে প্রচুর পরিমাণে ধন-সম্পদ আসছে, কিন্তু ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের জন্য সেই ধনের প্রতি আসক্ত হওয়া উচিত নয়। তার প্রতিটি পয়সা কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের প্রচারের জন্য ব্যয়

করা উচিত, ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের জন্য নয়। যখন প্রচুর পরিমাণে ধন লাভ হয়, তখন তা প্রচারকের পক্ষে বিপজ্জনক, কারণ তার একটি পয়সাও যদি তিনি তাঁর ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের জন্য ব্যয় করেন, তা হলে তাঁর অধঃপতন হয়। কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের প্রচারকদের অত্যন্ত সতর্ক হওয়া উচিত, যাতে এই আন্দোলন প্রচারের জন্য যে বিপুল অর্থের প্রয়োজন, তার অপব্যয় তাঁরা যেন না করেন। আমাদের দুঃখ-দুর্দশার কারণের জন্য যেন আমরা অর্থ সংগ্রহ না করি; শ্রীকৃষ্ণের জন্য তা ব্যবহার করতে হবে এবং তার ফলে আমরা নিত্য আনন্দ লাভ করতে পারব। ধন হচ্ছে লক্ষ্মী। নারায়ণের নিত্য সহচরী লক্ষ্মীজী যেন সর্বদা নারায়ণের সঙ্গে থাকেন, তা হলে আর অধঃপতনের কোন ভয় থাকবে না।

শ্লোক ৩৩

রাজতশ্চৌরতঃ শত্রোঃ স্বজনাৎ পশুপক্ষিতঃ ।
অর্থিভ্যঃ কালতঃ স্বস্মান্নিত্যং প্রাণার্থবদ্ভয়ম্ ॥ ৩৩ ॥

রাজতঃ—রাজার থেকে; **চৌরতঃ**—চোর এবং তস্কর থেকে; **শত্রোঃ**—শত্রু থেকে; **স্বজনাৎ**—আত্মীয়-স্বজনদের থেকে; **পশু-পক্ষিতঃ**—পশু-পক্ষী থেকে; **অর্থিভ্যঃ**—ভিক্ষুক এবং দানপ্রার্থীদের থেকে; **কালতঃ**—কাল থেকে; **স্বস্মাৎ**—এবং নিজের থেকে; **নিত্যম্**—সর্বদা; **প্রাণ-অর্থ-বৎ**—প্রাণবান এবং ধনবানের জন্য; **ভয়ম্**—ভয়।

অনুবাদ

যারা বলবান এবং ধনবান তারা সর্বদাই রাষ্ট্রের আইন, দস্যু-তস্কর, শত্রু, আত্মীয়স্বজন, পশু-পক্ষী, দানপ্রার্থী, কাল, এমন কি নিজের কাছ থেকেও সর্বদা ভীত থাকে।

তাৎপর্য

স্বস্মাৎ শব্দটির অর্থ 'নিজের কাছ থেকে'। ধনের প্রতি আসক্তির ফলে, সব চাইতে ধনী ব্যক্তিরাও নিজের কাছ থেকে পর্যন্ত ভয়ভীত থাকে। তারা ভয় পায় যে, হয়তো তারা তাদের টাকা কোন অসুরক্ষিত স্থানে রেখেছে অথবা কোন ভুল করেছে। সরকারের করের ভয় ছাড়াও চোরের ভয়, এমন কি আত্মীয়-স্বজনদের ভয়ে তারা ভীত থাকে। ধনী ব্যক্তির আত্মীয়-স্বজনেরা তার কাছ থেকে টাকা-

পয়সা নেওয়ার সুযোগে থাকে। কখনও কখনও এই সমস্ত আত্মীয়-স্বজনদের *স্বজনকদস্যু* বলে বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ 'আত্মীয়-স্বজনের বেশে তারা হচ্ছে দস্যু-তস্কর।' তাই, অনর্থক ধন সংগ্রহ নিষ্প্রয়োজন। জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে, "কে আমি?" এই প্রশ্ন করা এবং আত্মাকে উপলব্ধি করা। মানুষের কর্তব্য এই জড় জগতে জীবের স্থিতি উপলব্ধি করা এবং কিভাবে ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়া যায় সেই চেষ্টা করা।

শ্লোক ৩৪

শোকমোহভয়ক্রোধরাগক্লৈব্যশ্রমাদয়ঃ ।
যন্মূলাঃ স্যুর্নৃণাং জহ্যাৎ স্পৃহাং প্রাণার্থয়োর্বুধঃ ॥ ৩৪ ॥

শোক—শোক; **মোহ**—মোহ; **ভয়**—ভয়; **ক্রোধ**—ক্রোধ; **রাগ**—আসক্তি; **ক্লৈব্য**—দৈন্য; **শ্রম**—শ্রম; **আদয়ঃ**—ইত্যাদি; **যৎ-মূলাঃ**—এই সবের মূল কারণ; **স্যুঃ**—হয়; **নৃণাম্**—মানুষের; **জহ্যাৎ**—পরিত্যাগ করা উচিত; **স্পৃহাম্**—বাসনা; **প্রাণ**—দেহের বল এবং প্রতিষ্ঠার জন্য; **অর্থয়োঃ**—এবং অর্থ সংগ্রহের জন্য; **বুধঃ**—বুদ্ধিমান ব্যক্তি।

অনুবাদ

মানব-সমাজে যারা বুদ্ধিমান তাঁদের কর্তব্য শোক, মোহ, ভয়, ক্রোধ, আসক্তি, দৈন্য, শ্রম প্রভৃতির মূল কারণ বল এবং অর্থের স্পৃহা পরিত্যাগ করা।

তাৎপর্য

এটিই বৈদিক সভ্যতা এবং আধুনিক আসুরিক সভ্যতার পার্থক্য। বৈদিক সভ্যতায় বিচার করা হয় কিভাবে আত্মজ্ঞান লাভ করা যায়, এবং সেই উদ্দেশ্য সাধনের পরিপ্রেক্ষিতে জীবিকা নির্বাহের জন্য অধিক অর্থ উপার্জন না করার উপদেশ দেওয়া হয়। সমাজকে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র—এই চারটি বর্ণে বিভক্ত করা হত, এবং সমাজের সদস্যেরা তাঁদের জীবনের প্রয়োজনগুলি মেটাবার জন্য ন্যূনতম প্রয়াস করতেন। বিশেষ করে ব্রাহ্মণদের কোন জড় বাসনা থাকত না। ক্ষত্রিয়দের যেহেতু প্রজা শাসন করতে হত তাই তাঁদের ধন এবং প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন হত। কিন্তু বৈশ্যেরা শস্য উৎপাদন করে এবং গোপালন করে সন্তুষ্ট থাকতেন, এবং

যদি কিছু উদ্বৃত্ত থাকত, তা হলে তার বিনিময় করে বাণিজ্য করার অনুমোদন ছিল। শূদ্রেরাও সুখী ছিল, কারণ উচ্চ তিনটি বর্ণ তাদের আহার এবং বাসস্থানের ব্যবস্থা করতেন। আধুনিক যুগের আসুরিক সভ্যতায় কিন্তু ব্রাহ্মণ অথবা ক্ষত্রিয় নেই; রয়েছে কেবল তথাকথিত শ্রমিক এবং সমৃদ্ধিশালী ব্যবসায়ী সম্প্রদায়, যাদের জীবনের কোন উদ্দেশ্য নেই।

বৈদিক সভ্যতা অনুসারে জীবনের চরম সিদ্ধি হচ্ছে সন্ন্যাস গ্রহণ করা, কিন্তু বর্তমান সময়ে মানুষ জানে না সন্ন্যাস কেন গ্রহণ করা হয়। তা না জানার ফলে তারা মনে করে যে, সামাজিক দায়িত্ব এড়াবার জন্য সন্ন্যাস গ্রহণ করা হয়। কিন্তু সামাজিক দায়িত্ব এড়াবার জন্য সন্ন্যাস গ্রহণ করা হয় না। সাধারণত আধ্যাত্মিক জীবনের চতুর্থ স্তরে সন্ন্যাস গ্রহণ করা হয়। প্রথমে ব্রহ্মচর্য, তারপর গার্হস্থ্য, তারপর বানপ্রস্থ, এবং চরমে জীবনের বাকি সময় আত্মজ্ঞান লাভের জন্য পূর্ণরূপে যুক্ত হওয়ার উদ্দেশ্যে সন্ন্যাস গ্রহণ করা উচিত। ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের জন্য দ্বারে দ্বারে গিয়ে ভিক্ষা করে অর্থ সংগ্রহ করা সন্ন্যাস গ্রহণের উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু, যেহেতু কলিযুগে মানুষ ন্যূনাধিক ইন্দ্রিয়তৃপ্তি পরায়ণ, তাই অপরিণত অবস্থায় সন্ন্যাস গ্রহণ নিষেধ করা হয়েছে। শ্রীল রূপ গোস্বামী তাঁর *শ্রীউপদেশামৃতে* (২) লিখেছেন—

অত্যাহারঃ প্রয়াসশ্চ প্রজল্পো নিয়মাগ্রহঃ ।
জনসঙ্গশ্চ লৌল্যঞ্চ ষড়্ভির্ভক্তির্বিনশ্যতি ॥

"(১) প্রয়োজনের অতিরিক্ত আহার করা অথবা প্রয়োজনের অতিরিক্ত ধন সংগ্রহ করা; (২) জড় বিষয় লাভের জন্য অত্যধিক প্রয়াস করা; (৩) জড় বিষয় সম্বন্ধে অনর্থক প্রজল্প করা; (৪) আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনের জন্য শাস্ত্রবিধি অনুশীলন না করে, কেবল সেগুলির অনুসরণ করার জন্যই সেগুলির অনুশীলন করা, অথবা শাস্ত্রবিধি বর্জন করে স্বতন্ত্রভাবে বা খেয়ালখুশি মতো কার্য করা; (৫) কৃষ্ণভক্তি বিমুখ বিষয়ী ব্যক্তিদের সঙ্গ করা; এবং (৬) জড়-জাগতিক লাভের জন্য লোভী হওয়া—এই ছয়টি কার্যে অত্যধিক আসক্ত হলে, ভগবদ্ভক্তি বিনষ্ট হয়।" কৃষ্ণভক্তি প্রচারের জন্য সন্ন্যাসী কোন সংস্থা গঠন করতে পারেন; কিন্তু নিজের জন্য তার অর্থ সংগ্রহ করা উচিত নয়। আমরা নির্দেশ দিয়েছি যে, কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনে যে অর্থ সংগৃহীত হয়, তার অর্ধাংশ গ্রন্থ ছাপাবার জন্য এবং বাকি অর্ধাংশ অন্যান্য প্রয়োজনে, বিশেষ করে সারা পৃথিবী জুড়ে এই সংস্থার কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করার জন্য ব্যয় করা হবে। কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের পরিচালকদের এই বিষয়ে অত্যন্ত সচেতন থাকা উচিত। তা না হলে ধনই শোক, মোহ, ভয়, ক্রোধ, আসক্তি,

দারিদ্র্য এবং অনর্থক কঠোর পরিশ্রমের কারণ হবে। আমি যখন একা বৃন্দাবনে ছিলাম, তখন আমি মঠ-মন্দির প্রতিষ্ঠা করার কোন প্রচেষ্টা করিনি; পক্ষান্তরে, *ব্যাক টু গডহেড* পত্রিকা বিক্রি করে যে কয়েকটি টাকা আমি সংগ্রহ করতাম, তা নিয়েই আমি পূর্ণরূপে সন্তুষ্ট ছিলাম, এবং এইভাবে আমার নিজের ভরণপোষণ করতাম এবং গ্রন্থও ছাপাতাম। বিদেশে গিয়েও আমি সেভাবেই জীবন-যাপন করছিলাম, কিন্তু ইউরোপীয়ান এবং আমেরিকানরা যখন আমাকে প্রচুর ধন দিতে শুরু করল, তখন আমি মন্দির প্রতিষ্ঠা করতে এবং শ্রীবিগ্রহের অর্চনা করতে শুরু করি। সেই নীতি যেন সব সময় অনুসরণ করা হয়। যে ধন সংগ্রহ হবে, তা শ্রীকৃষ্ণের জন্য ব্যয় করতে হবে এবং একটি পয়সাও ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের জন্য ব্যয় করা উচিত নয়। এটিই ভাগবত নীতি।

শ্লোক ৩৫

মধুকারমহাসর্পৌ লোকেঽস্মিন্নো গুরূত্তমৌ ।
বৈরাগ্যং পরিতোষং চ প্রাপ্তা যচ্ছিক্ষয়া বয়ম্ ॥ ৩৫ ॥

মধুকার—ফুলে ফুলে মধু সংগ্রহকারী মৌমাছি; **মহা-সর্পৌ**—বিশাল সর্প (অজগর, যে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যায় না); **লোকে**—এই পৃথিবীতে; **অস্মিন্**—এই; **নঃ**—আমাদের; **গুরু**—গুরু; **উত্তমৌ**—উত্তম; **বৈরাগ্যম্**—বৈরাগ্য; **পরিতোষম্ চ**—এবং সন্তোষ; **প্রাপ্তাঃ**—লাভ করে; **যৎ-শিক্ষয়া**—যার উপদেশ অনসারে; **বয়ম্**—আমরা।

অনুবাদ

মৌমাছি এবং অজগর, এই দুজন আমাদের শ্রেষ্ঠ গুরু, যারা আমাদের স্বল্প সংগ্রহে সন্তুষ্ট থাকার এবং এক স্থানে অবস্থান করার আদর্শ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করে।

শ্লোক ৩৬

বিরাগঃ সর্বকামেভ্যঃ শিক্ষিতো মে মধুব্রতাৎ ।
কৃচ্ছ্রাপ্তং মধুবদ্ বিত্তং হত্বাপ্যন্যো হরেৎ পতিম্ ॥ ৩৬ ॥

বিরাগঃ—অনাসক্তি; **সর্ব-কামেভ্যঃ**—সমস্ত জড় বাসনা থেকে; **শিক্ষিতঃ**—শিক্ষা লাভ করেছি; **মে**—আমাকে; **মধু-ব্রতাৎ**—মৌমাছি থেকে; **কৃচ্ছ্র**—বহু কষ্টে; **আপ্তম্**—লব্ধ; **মধুবৎ**—মধুর মতো; **বিত্তম্**—ধন; **হত্বা**—হত্যা করে; **অপি**—ও; **অন্যঃ**—অন্য; **হরেৎ**—হরণ করে; **পতিম্**—স্বামীকে।

অনুবাদ

মৌমাছির কাছ থেকে আমি সঞ্চিত ধনের প্রতি অনাসক্ত হওয়ার শিক্ষা লাভ করেছি, কারণ ধন যদিও মধুর মতোই মধুর, যে কোন ব্যক্তি ধনপতিকে হত্যা করে সেই ধন হরণ করতে পারে।

তাৎপর্য

মৌমাছি যে মধু সংগ্রহ করে তা বলপূর্বক হরণ করে নেওয়া হয়। অতএব কেউ যখন ধন সংগ্রহ করে, তখন তার বোঝা উচিত যে, সরকার অথবা চোরেরা তার ধনের জন্য তাকে উপদ্রব করবে। এমন কি তাকে হত্যা পর্যন্ত করতে পারে। বলা হয়েছে যে, বিশেষ করে এই কলিযুগে, সরকার নাগরিকদের ধন রক্ষা করার পরিবর্তে, আইনের বলে তাদের থেকে ধন ছিনিয়ে নেবে। সেই বিজ্ঞ ব্রাহ্মণ তাই বিবেচনা করেছিলেন যে, তিনি ধন সংগ্রহ করবেন না। মানুষের কর্তব্য তার যতটুকু প্রয়োজন ঠিক ততটুকুই গ্রহণ করা। প্রচুর ধন সংগ্রহ করা নিষ্প্রয়োজন, কারণ তার ফলে সরকার এবং দস্যু-তস্করদের দ্বারা ধন লুণ্ঠিত হওয়ার ভয় থাকে।

শ্লোক ৩৭

অনীহঃ পরিতুষ্টাত্মা যদৃচ্ছোপনতাদহম্ ।
নো চেচ্ছয়ে বহূহানি মহাহিরিব সত্ত্ববান্ ॥ ৩৭ ॥

অনীহঃ—অধিক সংগ্রহ করার বাসনা-রহিত; **পরিতুষ্ট**—অত্যন্ত সন্তুষ্ট; **আত্মা**—আত্মা; **যদৃচ্ছা**—বিনা প্রচেষ্টায়; **উপনতাৎ**—লব্ধ বস্তুর দ্বারা; **অহম্**—আমি; **ন**—না; **চেৎ**—যদি; **শয়ে**—আমি শয়ন করি; **বহু**—বহু; **অহানি**—দিন; **মহা-অহিঃ**—অজগর; **ইব**—সদৃশ; **সত্ত্ববান্**—ধৈর্যশীল।

অনুবাদ

আমি কোন কিছু লাভ করার প্রয়াস করি না, আপনা থেকেই যা কিছু আমার কাছে আসে তা নিয়েই আমি সন্তুষ্ট থাকি। আমি যদি বহুদিন কিছু না পাই, তা হলেও আমি অবিচলিত থেকে অজগরের মতো ধৈর্যশীল হয়ে শায়িত থাকি।

তাৎপর্য

মানুষের কর্তব্য মৌমাছির কাছে অনাসক্তি শিক্ষা লাভ করা, কারণ তারা বিন্দু বিন্দু মধু সংগ্রহ করে মৌচাকে তা সঞ্চয় করে, কিন্তু তারপর কেউ এসে বলপূর্বক সেই মধু হরণ করে নেয়। এইভাবে মৌমাছি সম্পূর্ণরূপে নিঃস্ব হয়ে যায়। তাই মৌমাছির কাছ থেকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত ধন সঞ্চয় না করার শিক্ষা লাভ করা উচিত। তেমনই, অজগরের কাছে বহুদিন অনাহারে এক স্থানে থাকার এবং যখন আপনা থেকেই কিছু আসে, তখন তা আহার করার শিক্ষা লাভ করা উচিত। এইভাবে বিদ্বান ব্রাহ্মণ মৌমাছি ও অজগর নামক দুই প্রাণীর কাছে লব্ধ শিক্ষা প্রদান করেন।

শ্লোক ৩৮

ক্বচিদল্পং ক্বচিদ্ ভূরি ভুঞ্জেঽন্নং স্বাদ্বস্বাদু বা ।
ক্বচিদ্ ভূরিগুণোপেতং গুণহীনমুত ক্বচিৎ ।
শ্রদ্ধয়োপহৃতং ক্বাপি কদাচিন্মানবর্জিতম্ ।
ভুঞ্জে ভুক্ত্বাথ কস্মিংশ্চিদ্ দিবা নক্তং যদৃচ্ছয়া ॥ ৩৮ ॥

ক্বচিৎ—কখনও কখনও; **অল্পম্**—অতি অল্প; **ক্বচিৎ**—কখনও; **ভূরি**—প্রচুর; **ভুঞ্জে**—আমি আহার করি; **অন্নম্**—খাদ্য; **স্বাদু**—সুস্বাদু; **অস্বাদু**—বিস্বাদ; **বা**—অথবা; **ক্বচিৎ**—কখনও; **ভূরি**—প্রচুর; **গুণ-উপেতম্**—সুগন্ধ; **গুণ-হীনম্**—গন্ধহীন; **উত**—অথবা; **ক্বচিৎ**—কখনও; **শ্রদ্ধয়া**—শ্রদ্ধা সহকারে; **উপহৃতম্**—কারও দ্বারা আনীত; **ক্বাপি**—কখনও; **কদাচিৎ**—কখনও; **মান-বর্জিতম্**—অশ্রদ্ধা সহকারে প্রদত্ত; **ভুঞ্জে**—আমি আহার করি; **ভুক্ত্বা**—আহার করার পর; **অথ**—এইভাবে; **কস্মিন্ চিৎ**—কখনও, কোনও স্থানে; **দিবা**—দিনের বেলা; **নক্তম্**—অথবা রাত্রে; **যদৃচ্ছয়া**—যা লাভ হয়।

অনুবাদ

কখনও আমি অতি অল্প আহার করি এবং কখনও প্রচুর আহার করি। কখনও সেই খাদ্য অত্যন্ত সুস্বাদু, এবং কখনও তা বিস্বাদ। কখনও গভীর শ্রদ্ধা সহকারে সেই খাদ্য আমাকে দেওয়া হয় এবং কখনও অত্যন্ত অবহেলাভরে তা দেওয়া হয়। কখনও আমি দিনের বেলা আহার করি এবং কখনও রাত্রে। এইভাবে অনায়াসে আমি যা পাই তাই আহার করি।

শ্লোক ৩৯

ক্ষৌমং দুকূলমজিনং চীরং বল্কলমেব বা ।
বসেঽন্যদপি সম্প্রাপ্তং দিষ্টভুক্ তুষ্টধীরহম্ ॥ ৩৯ ॥

ক্ষৌমম্—ক্ষৌম বস্ত্র; **দুকূলম্**—রেশম অথবা সুতীর বস্ত্র; **অজিনম্**—মৃগচর্ম; **চীরম্**—কৌপীন; **বল্কলম্**—বাকল; **এব**—যথারূপ; **বা**—অথবা; **বসে**—আমি পরিধান করি; **অন্যৎ**—অন্য কিছু; **অপি**—যদিও; **সম্প্রাপ্তম্**—যেমন পাওয়া যায়; **দিষ্ট-ভুক্**—ভাগ্যবশত; **তুষ্ট**—সন্তুষ্ট; **ধীঃ**—মন; **অহম্**—আমি হই।

অনুবাদ

আমার দেহ আচ্ছাদন করার জন্য আমি ক্ষৌম বসন, রেশম, সুতী, বল্কল, মৃগচর্ম আদি ভাগ্যবশত যা কিছু পাই, তা নিয়েই পূর্ণরূপে সন্তুষ্ট থাকি।

শ্লোক ৪০

ক্বচিচ্ছয়ে ধরোপস্থে তৃণপর্ণাশ্মভস্মসু ।
ক্বচিৎ প্রাসাদপর্যঙ্কে কশিপৌ বা পরেচ্ছয়া ॥ ৪০ ॥

ক্বচিৎ—কখনও; **শয়ে**—আমি শয়ন করি; **ধর-উপস্থে**—ভূপৃষ্ঠে; **তৃণ**—ঘাস; **পর্ণ**—পাতা; **অশ্ম**—পাথর; **ভস্মসু**—অথবা ছাইয়ের গাদার উপর; **ক্বচিৎ**—কখনও; **প্রাসাদ**—প্রাসাদে; **পর্যঙ্কে**—উত্তম পালঙ্কে; **কশিপৌ**—বালিশের উপর; **বা**—অথবা; **পর**—অন্যের; **ইচ্ছয়া**—ইচ্ছার দ্বারা।

অনুবাদ

কখনও আমি ধরাপৃষ্ঠে, কখনও পাতার উপর, কখনও ঘাস বা পাথরের উপর, কখনও বা ভস্মস্তূপে, আবার কখনও অন্যের ইচ্ছাক্রমে প্রাসাদে উত্তম পালঙ্কে বালিশের উপর শয়ন করি।

তাৎপর্য

বিজ্ঞ ব্রাহ্মণের বর্ণনা বিভিন্ন প্রকার জন্মের ইঙ্গিত করছে, কারণ জীব তার দেহ অনুসারে শয়ন করে। জীব কখনও পশুরূপে জন্মগ্রহণ করে, আবার কখনও রাজারূপে। সে যখন পশুরূপে জন্ম গ্রহণ করে, তখন সে ভূপৃষ্ঠে শয়ন করে, এবং সে যখন রাজারূপে অথবা অত্যন্ত ধনীরূপে জন্মগ্রহণ করে, তখন সে বিশাল প্রাসাদে পালঙ্ক আদি আসবাবে সুসজ্জিত কক্ষে শয়ন করে। এই সমস্ত সুযোগগুলি অবশ্য জীবের ইচ্ছাক্রমে লাভ হয় না; পক্ষান্তরে, ভগবানের ইচ্ছাক্রমে (*পরেচ্ছয়া*), অথবা মায়ার আয়োজন অনুসারে লাভ হয়। সেই সম্বন্ধে *ভগবদ্গীতায়* (১৮/৬১) বলা হয়েছে—

ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি ।
ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া ॥

"হে অর্জুন, পরমেশ্বর ভগবান সমস্ত জীবকে দেহরূপ যন্ত্রে আরোহণ করিয়ে মায়ার দ্বারা ভ্রমণ করান।" জীব তার জড় বাসনা অনুসারে বিভিন্ন প্রকার শরীর প্রাপ্ত হয়, যা ভগবানের নির্দেশ অনুসারে জড়া প্রকৃতি কর্তৃক প্রদত্ত যন্ত্র ছাড়া আর কিছু নয়। ভগবানের ইচ্ছায় জীবকে বিভিন্নভাবে শয়ন করার উপায় সমন্বিত বিভিন্ন প্রকার শরীর ধারণ করতে হয়।

শ্লোক ৪১

ক্বচিৎ স্নাতোঽনুলিপ্তাঙ্গঃ সুবাসাঃ স্রগ্ব্যলঙ্কৃতঃ ।
রথেভাশ্বৈশ্চরে ক্বাপি দিগ্বাসা গ্রহবদ্ বিভো ॥ ৪১ ॥

ক্বচিৎ—কখনও; **স্নাতঃ**—সুন্দরভাবে স্নান করে; **অনুলিপ্ত-অঙ্গঃ**—সারা শরীরে চন্দন লেপন করে; **সু-বাসাঃ**—অতি সুন্দর বসন পরিধান করে; **স্রগ্বী**—ফুলমালায় সজ্জিত হয়ে; **অলঙ্কৃতঃ**—বিভিন্ন প্রকার অলঙ্কারে সুশোভিত হয়ে; **রথ**—রথে; **ইভ**—হাতির উপর; **অশ্বৈঃ**—অথবা ঘোড়ার পিঠে; **চরে**—আমি বিচরণ করি; **ক্বাপি**—কখনও; **দিক্-বাসাঃ**—সম্পূর্ণরূপে নগ্ন; **গ্রহবৎ**—পিশাচগ্রস্ত; **বিভো**—হে প্রভু।

অনুবাদ

হে প্রভু, কখনও কখনও আমি সুন্দরভাবে স্নান করে, সারা শরীরে চন্দন লেপন করে, এবং ফুলমালা, মনোহর বসন ও অলঙ্কারে বিভূষিত হয়ে রাজার মতো রথে, হস্তীতে অথবা ঘোড়ায় চড়ে ভ্রমণ করি। কখনও আবার পিশাচগ্রস্ত ব্যক্তির মতো দিগম্বর হয়ে ভ্রমণ করি।

শ্লোক ৪২

নাহং নিন্দে ন চ স্তৌমি স্বভাববিষমং জনম্ ।
এতেষাং শ্রেয় আশাসে উতৈকাত্ম্যং মহাত্মনি ॥ ৪২ ॥

ন—না; **অহম্**—আমি; **নিন্দে**—নিন্দা করি; **ন**—কখনই না; **চ**—ও; **স্তৌমি**—প্রশংসা করি; **স্ব-ভাব**—যার প্রকৃতি; **বিষমম্**—বিপরীত; **জনম্**—জীব বা মানুষ; **এতেষাম্**—তাদের সকলের; **শ্রেয়ঃ**—চরম লাভ; **আশাসে**—আমি প্রার্থনা করি; **উত**—বস্তুতপক্ষে; **ঐকাত্ম্যম্**—একত্ব; **মহা-আত্মনি**—পরমাত্মা বা পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণে।

অনুবাদ

বিভিন্ন ব্যক্তির মনোভাব বিভিন্ন। তাই আমি তাদের প্রশংসাও করি না অথবা নিন্দাও করি না। আমি কেবল এই আশা করে তাদের মঙ্গল কামনা করি যে, তারা যেন পরমাত্মা বা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ঐকান্তিকতা লাভ করে।

তাৎপর্য

ভক্তিযোগের স্তরে আসা মাত্রই মানুষ পূর্ণরূপে উপলব্ধি করতে পারে যে, জীবনের লক্ষ্য হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবান বাসুদেব (*বাসুদেবঃ সর্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ*)। এটিই সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রের নির্দেশ (*বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদ্যঃ, সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ*)। জড়-জাগতিক যোগ্যতার জন্য কারও প্রশংসা করা অথবা জড়-জাগতিক অযোগ্যতার জন্য কাউকে নিন্দা করে কোন লাভ হয় না। জড় জগতে ভাল এবং মন্দের প্রকৃত কোন অর্থ নেই, কারণ কেউ যদি ভাল হয়, তা হলে সে উচ্চতর লোকে উন্নীত হতে পারে এবং কেউ যদি খারাপ হয়, তা হলে সে নিম্নলোকে অধঃপতিত হতে পারে। কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই তারা জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ। বিভিন্ন মনোভাব সমন্বিত ব্যক্তিরা কখনও উচ্চলোকে উন্নীত হয়

আবার কখনও নিম্নলোকে অধঃপতিত হয়, কিন্তু তার কোনটিই জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য নয়। পক্ষান্তরে, জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে, এই উন্নতি এবং অবনতি থেকে মুক্ত হয়ে কৃষ্ণভক্তি অবলম্বন করা। তাই সাধু কখনও তথাকথিত ভাল এবং মন্দের ভেদ দর্শন না করে, কামনা করেন যে, সকলেই যেন কৃষ্ণভক্তিতে সুখী হয়, যা হচ্ছে জীবনের চরম উদ্দেশ্য।

শ্লোক ৪৩

বিকল্পং জুহুয়াচ্চিত্তৌ তাং মনস্যর্থবিভ্রমে ।
মনো বৈকারিকে হুত্বা তং মায়ায়াং জুহোত্যনু ॥ ৪৩ ॥

বিকল্পম্—ভেদভাব (ভাল এবং মন্দ, এক ব্যক্তির সঙ্গে আরেক ব্যক্তির, এক জাতির সঙ্গে আর এক জাতির মধ্যে পরস্পরে বিভেদ); **জুহুয়াৎ**—আহুতিস্বরূপ নিবেদন করা উচিত; **চিত্তৌ**—চিত্তরূপ অগ্নিতে; **তাম্**—সেই চেতনা; **মনসি**—মনে; **অর্থ-বিভ্রমে**—সমস্ত সঙ্কল্প এবং বিকল্পের মূল; **মনঃ**—মন; **বৈকারিকে**—অহঙ্কারে; **হুত্বা**—আহুতিরূপে নিবেদন করে; **তম্**—সেই অহঙ্কার; **মায়ায়াম্**—মহত্তত্ত্বে; **জুহোতি**—আহুতিরূপে নিবেদন; **অনু**—এই নীতি অনুসারে।

অনুবাদ

ভাল এবং মন্দের যে মনোধর্মপ্রসূত ভেদভাব তার ঐক্য চিন্তা করে, তারপর তাদের মনে অর্পণ করতে হবে। তারপর মনকে অহঙ্কারে, এবং অহঙ্কারকে মহত্তত্ত্বে আহুতিস্বরূপ নিবেদন করা কর্তব্য। এটিই মিথ্যা ভেদভাব জয় করার পন্থা।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে যোগী কিভাবে জড় আসক্তি থেকে মুক্ত হতে পারেন। জড় আকর্ষণের ফলে কর্মীরা নিজেদের দর্শন করতে পারে না। জ্ঞানীরা জড় এবং চেতনের পার্থক্য নিরূপণ করতে পারেন, কিন্তু যোগীরা, যাঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হচ্ছেন ভক্তিযোগী, তাঁরা ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে চান। কর্মীরা সম্পূর্ণরূপে মায়াচ্ছন্ন, জ্ঞানীরা মায়াচ্ছন্ন নয় আবার তাদের বাস্তবিক জ্ঞানও নেই, কিন্তু যোগীরা, বিশেষ করে ভক্তিযোগীরা, সম্পূর্ণরূপে চিন্ময় স্তরে অবস্থিত। সেই সম্বন্ধে *ভগবদ্গীতায়* (১৪/২৬) বলা হয়েছে—

মাং চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে ।
স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥

"যিনি ঐকান্তিক ভক্তি সহকারে আমার সেবা করেন, এবং যিনি কোন অবস্থাতেই অধঃপতিত হন না, তিনিই প্রকৃতির সমস্ত গুণ অতিক্রম করে ব্রহ্মভূত অবস্থায় উন্নীত হয়েছেন।" এইভাবে ভক্তের পদ সুরক্ষিত। ভক্ত ভক্তির পন্থা অবলম্বন করা মাত্রই চিন্ময় স্তরে উন্নীত হন। জ্ঞানী, হঠযোগী আদি অন্যেরা মনোধর্ম ও অহঙ্কার নিবৃত্তির স্তরে জড় ভেদভাব ত্যাগ করে, "আমি জড় পদার্থের দ্বারা গঠিত এই শরীরটি নই" এই জ্ঞান প্রাপ্ত হয়ে ধীরে ধীরে চিন্ময় স্তরে উন্নীত হতে পারেন। মানুষের কর্তব্য অহঙ্কারকে মহত্তত্ত্বে এবং মহত্তত্ত্বকে পরম শক্তিমানে বিলীন করে দেওয়া। এটিই জড় আকর্ষণ থেকে মুক্ত হওয়ার পন্থা।

শ্লোক ৪৪

আত্মানুভূতৌ তাং মায়াং জুহুয়াৎ সত্যদৃঙ্মুনিঃ ।
ততো নিরীহো বিরমেৎ স্বানুভূত্যাত্মনি স্থিতঃ ॥ ৪৪ ॥

আত্ম-অনুভূতৌ—আত্ম-উপলব্ধিতে; **তাম্**—তা; **মায়াম্**—অহঙ্কারকে; **জুহুয়াৎ**—আহুতিরূপে নিবেদন করা উচিত; **সত্য-দৃক্**—যিনি প্রকৃতপক্ষে পরম সত্যকে উপলব্ধি করেছেন; **মুনিঃ**—এই প্রকার মননশীল ব্যক্তি; **ততঃ**—এই আত্ম-উপলব্ধির ফলে; **নিরীহঃ**—জড় বাসনাশূন্য; **বিরমেৎ**—জড়-জাগতিক কার্যকলাপ থেকে সম্পূর্ণরূপে বিরত হওয়া কর্তব্য; **স্ব-অনুভূতি-আত্মনি**—আত্ম-উপলব্ধিতে; **স্থিতঃ**—এইভাবে অবস্থিত হয়ে।

অনুবাদ

বিজ্ঞ মননশীল ব্যক্তির অবশ্য কর্তব্য সংসারকে মায়া বলে উপলব্ধি করা। আত্ম-উপলব্ধির ফলেই কেবল তা সম্ভব। সত্যদ্রষ্টা আত্মজ্ঞানী ব্যক্তির কর্তব্য আত্ম-উপলব্ধিতে অবস্থিত হয়ে সমস্ত জড়-জাগতিক কার্যকলাপ থেকে বিরত হওয়া।

তাৎপর্য

দেহের উপাদান বিশ্লেষণ করার মাধ্যমে নিশ্চিতভাবে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে মাটি, জল, আগুন, বায়ু আদি দেহের উপাদানগুলি থেকে আত্মা সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন। এইভাবে মনীষী বা মুনি দেহ এবং আত্মার পার্থক্য উপলব্ধি

করতে পারেন, এবং আত্মার এই উপলব্ধির পর তিনি অনায়াসে পরমাত্মাকে হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন। কেউ যদি এইভাবে উপলব্ধি করতে পারেন যে, জীবাত্মা পরমাত্মার অধীন, তখন তিনি তাঁর স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারেন। *ভগবদ্গীতার* ত্রয়োদশ অধ্যায়ে বিশ্লেষণ করা হয়েছে যে, দেহের ভিতরে দুটি আত্মা রয়েছে। দেহকে বলা হয় ক্ষেত্র এবং সেই ক্ষেত্রে নিবাসকারী দুজন ক্ষেত্রজ্ঞ রয়েছেন—পরমাত্মা এবং জীবাত্মা। একই বৃক্ষে (জড় দেহে) দুটি পাখির মতো পরমাত্মা এবং জীবাত্মা বসে রয়েছেন। জীবাত্মা একটি স্বরূপ-বিস্মৃত পাখির মতো, অন্য পাখিটির উপদেশের অপেক্ষা না করে সেই গাছের ফল খাচ্ছে, আর অন্য পাখিটি কেবল তার সখারূপ পাখিটির কার্যকলাপ সাক্ষীরূপে দর্শন করছে। স্বরূপ-বিস্মৃত পাখিটি যখন তার পরম বন্ধুকে চিনতে পারে, যে সর্বদা তার সঙ্গে থেকে তাকে বিভিন্ন শরীরে পরিচালনা করার চেষ্টা করছে, তখন সে সেই পরম পক্ষীটির শ্রীপাদপদ্মের শরণাগত হয়। যোগের পন্থায় বিশ্লেষণ করা হয়েছে, *ধ্যানবস্থিততদ্গতেন মনসা পশ্যন্তি যং যোগিনঃ।* কেউ যখন সিদ্ধ যোগী হন, তখন তিনি ধ্যানের দ্বারা তাঁর পরম বন্ধুকে দর্শন করতে পেরে তাঁর শরণাগত হন। এটিই ভক্তিযোগের শুরু বা প্রকৃত কৃষ্ণভাবনাময় জীবন।

শ্লোক ৪৫

স্বাত্মবৃত্তং ময়েত্থং তে সুগুপ্তমপি বর্ণিতম্ ।
ব্যপেতং লোকশাস্ত্রাভ্যাং ভবান্ হি ভগবৎপরঃ ॥ ৪৫ ॥

স্ব-আত্ম-বৃত্তম্—আত্ম-উপলব্ধির বৃত্তান্ত; **ময়া**—আমার দ্বারা; **ইত্থম্**—এইভাবে; **তে**—আপনাকে; **সুগুপ্তম্**—অত্যন্ত গোপনীয়; **অপি**—যদিও; **বর্ণিতম্**—বর্ণিত; **ব্যপেতম্**—রহিত; **লোক-শাস্ত্রাভ্যাম্**—সাধারণ মানুষ অথবা সাধারণ গ্রন্থের অভিমত; **ভবান্**—আপনি; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **ভগবৎ-পরঃ**—ভগবানকে পূর্ণরূপে উপলব্ধি করেছেন।

অনুবাদ

প্রহ্লাদ মহারাজ, আপনি অবশ্যই একজন আত্ম-তত্ত্ববেত্তা ভগবদ্ভক্ত। আপনি সাধারণ মানুষের অথবা তথাকথিত শাস্ত্রের অভিমতের অপেক্ষা করেন না। তাই আমি নিঃসঙ্কোচে আমার আত্ম-উপলব্ধির ইতিহাস আপনার কাছে বর্ণনা করলাম।

তাৎপর্য

যে ব্যক্তি প্রকৃতই কৃষ্ণভক্ত, তিনি তথাকথিত জনসাধারণের মতামত এবং বৈদিক ও দার্শনিক গ্রন্থের অপেক্ষা করেন না। সেই প্রকার ভক্ত প্রহ্লাদ মহারাজ সর্বদাই তাঁর পিতার এবং তাঁকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য যাদের নিযুক্ত করা হয়েছিল, সেই তথাকথিত গুরুর ভ্রান্ত উপদেশ উপেক্ষা করেছিলেন। পক্ষান্তরে, তিনি কেবল তাঁর গুরু শ্রীনারদ মুনির উপদেশ অনুসরণ করেছিলেন, এবং তাই সর্বদাই তিনি ছিলেন মহাভাগবত। এটিই বুদ্ধিমান ভক্তের স্বভাব। *শ্রীমদ্ভাগবতে* নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, *যজ্ঞৈঃ সংকীর্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ*। যে ব্যক্তি যথার্থই বুদ্ধিমান, তাঁর কর্তব্য শ্রীকৃষ্ণের নিত্য দাসরূপে নিজের পরিচয় উপলব্ধি করে কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনে যোগদান করা এবং নিরন্তর ভগবানের দিব্য নাম সমন্বিত হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র—**হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে / হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে** জপ করা।

শ্লোক ৪৬

শ্রীনারদ উবাচ

ধর্মং পারমহংস্যং বৈ মুনেঃ শ্রুত্বাসুরেশ্বরঃ ।
পূজয়িত্বা ততঃ প্রীত আমন্ত্র্য প্রযযৌ গৃহম্ ॥ ৪৬ ॥

শ্রী-নারদঃ উবাচ—নারদ মুনি বললেন; **ধর্মম্**—ধর্ম; **পারমহংস্যম্**—পরমহংস বা সিদ্ধ পুরুষদের; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **মুনেঃ**—মুনির কাছে; **শ্রুত্বা**—এইভাবে শ্রবণ করে; **অসুর-ঈশ্বরঃ**—অসুররাজ প্রহ্লাদ মহারাজ; **পূজয়িত্বা**—সেই মহাত্মাকে পূজা করে; **ততঃ**—তারপর; **প্রীতঃ**—অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে; **আমন্ত্র্য**—অনুমতি গ্রহণ করে; **প্রযযৌ**—সেই স্থান ত্যাগ করেছিলেন; **গৃহম্**—গৃহের উদ্দেশ্যে।

অনুবাদ

নারদ মুনি বললেন—অসুরেশ্বর প্রহ্লাদ মহারাজ সেই মহাত্মার উপদেশ শ্রবণ করে পারমহংস্য-ধর্ম হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন। তারপর সেই মহাত্মাকে পূজা করে তাঁর অনুমতি নিয়ে গৃহে প্রস্থান করেছিলেন।

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর উক্তির উদ্ধৃতি দিয়ে *শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে* (*মধ্য* ৮/১২৮) উল্লেখ করা হয়েছে—

কিবা বিপ্র, কিবা ন্যাসী, শূদ্র কেনে নয়।
যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা সেই 'গুরু' হয়॥

যিনি কৃষ্ণ-তত্ত্ববেত্তা, তিনিই গুরু হতে পারেন। তাই প্রহ্লাদ মহারাজ যদিও ছিলেন অসুরদের রাজা এবং গৃহস্থ, তবুও তিনি ছিলেন নরশ্রেষ্ঠ পরমহংস, এবং তাই তিনি আমাদের গুরু। সেই জন্য গুরু বা মহাজনদের তালিকায় প্রহ্লাদ মহারাজের নাম উল্লেখ করা হয়েছে—

স্বয়ম্ভুর্নারদঃ শম্ভুঃ কুমারঃ কপিলো মনুঃ।
প্রহ্লাদো জনকো ভীষ্মো বলির্বৈয়াসকির্বয়ম্॥

(*শ্রীমদ্ভাগবত* ৬/৩/২০)

সিদ্ধান্ত হচ্ছে এই যে, পরমহংস হচ্ছেন ভগবৎ-প্রিয় মহাভাগবত। এই পরমহংস ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ অথবা সন্ন্যাস—জীবনের যে স্তরেই থাকুন না কেন, তিনি সমভাবে মুক্ত এবং উন্নত।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের সপ্তম স্কন্ধের 'সিদ্ধ পুরুষের আচরণ' নামক ত্রয়োদশ অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।